হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (র.)

অনুবাদ

ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক

মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

gve`v Iqv gvÖAv`

মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (র.)

অনুবাদ

ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া

মাব্‌দা ওয়া মা'আদ

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.

অনুবাদ
ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক

প্রচ্ছদ
অবদুর রোউফ সরকার

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং
৪র্থ সংস্করণ

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ
যোগাযোগ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১১৯০৭৪৭৪০৭

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়
মাত্র আশি টাকা

MABDA WA MA-AD : Collection of spiritual descriptions by Hazrat Mozaddede Alfe Sani Rh. translated into Bengali by Dr. A.F.M. Abu Bakar Siddique and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuighar, Narayangonj. Printed by Shawkat Printers, 190/B Fakirapool, Dhaka-1000, Cover Designer Abdur Rouf Sarker

---

Exchange Tk. 80/- U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0023-1

মুজাদ্দিদের মাজারে আজ এ দিল বেকারার।
আকাশ তলে মাটি যেমন আলোর সম্ভার।।
পায় সিতারা শরম যে এই ধূলি কণা দেখে,
হেথায় গোপন মর্দে মুমিন সাহেবে আস্‌রার।।
জাহাঙ্গীরের সম্মুখে যাঁর হয়নি নত শির,
নিঃশ্বাসে যাঁর উষ্ণতা পায় আজাদী–আহ্‌রার।।
হিন্দে যিনি মিল্লাতেরি ছিলেন নেগাহবান,
আল্লাহ্‌ যাঁকে ক্রান্তিকালে করেন হুঁশিয়ার।।
আর্‌জি ওঠে তখন প্রাণের: দাও ফকীরি মোরে,
দুই চোখে হায় দৃষ্টি তবু জাগ্রত নই আর।।

আফসোস এই জিন্দেগীতে হওনি শাহীন তুমি,
দৃষ্টি তোমার এই জীবনে চেনেনি ফিত্‌রাত,
সকল ভাগ্য নিয়ন্তার এ অমোঘ বিধান জেনো
দুর্বলতার কঠিন সাজা মৃত্যু অপঘাত।।

–আল্লামা ইকবাল

অনুবাদ : ফররুখ আহমদ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মানুষ নিজেকে দেখতে পায় না। কারণ সে তার নিকটতম। দূরের দিকেই মানুষের দৃষ্টি। মানুষ দেখে। দেখে আর বিস্মিত হয়। কখনো সে প্রজ্ঞায় সমর্পিত হয়। কখনো প্রেমে। নিসর্গের হাজার লীলা। পুষ্প, পাখি, নদী, পর্বত, বৃক্ষ অরণ্য। খরা বৃষ্টি মহামারী। আর আকাশের অকর্ষিত আকর্ষণ। নক্ষত্র চন্দ্র নীহারিকা। চন্দ্র সূর্য ছায়াপথ। সকল কিছুই তাকে মাতায়। ভাবায়। মোহিত করে। তার অতিমোহিত দৃষ্টি তাকে বিভ্রান্ত করে। কখনো করে জড়বাদী, কখনো ভাববাদী, কখনো সমাজবাদী, কখনো মওদুদীবাদী। মানুষ কি জানবে সকল কিছুই আছে তার নিজেরই অভ্যন্তরে? নিজেকে না দেখেই যদি অপরকে দেখে, নিজেকে না চিনেই যদি অপরকে চিনতে চায় তবে কীভাবে পূর্ণ হবে প্রজ্ঞা। প্রেম। শুধু বাহির নয়, শুধু ভিতর নয়। সত্যবাদী তো তিনিই যিনি দু' দিকেই তাকাতে সক্ষম। মানবতাবাদী তো তিনিই যিনি মানুষের আত্মরহস্য বাহির রহস্য দুদিকেই জ্ঞানী। দুটি পাখা না হলে সত্যের সীমাহীন আকাশে উড়াল কী সম্ভব?

শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর অনুসারী হতে হবে। এটা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যই দ্বিধাহীন দাবী। তিনিই মানুষকে দিয়েছেন প্রজ্ঞা ও প্রেমের পূর্ণ দিকনির্দেশনা। তিনিই আমাদের খণ্ডিত দিশাহারা ভাবনা বেদনা প্রেম প্রজ্ঞাকে করেছেন অসীম অখণ্ড অক্ষয় সত্তার প্রেমে আবেগোত্তাল। মুখ থুবড়ে পড়া মানবতা। ওঠো। তাকাও। হেরার ঐ রাজতোরণের কি অনির্বাণ ঝলক। শিখে নাও নিয়ম। জীবনের। প্রেমের। আত্মরহস্যের। শরীয়তের। মারেফতের।

তাঁরই স. খাস উত্তরাধিকারী ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. তো এই ভূখণ্ডেই এসেছিলেন। এসেছিলেন মানবতার একমাত্র মুক্তিমঞ্জিল ইসলামের পূর্ণিমা প্রতিষ্ঠা করতে। কী সুন্দর করে বলেছেন তিনি, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস অনুযায়ী আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য প্রথম ফরজ। তারপর তাকে আসতে হবে শরীয়তের সীমানায়। শুধু আসতে হবে নয়। এখানেই তাকে স্থির হতে হবে আজীবন। আর শরীয়ত হলো জ্ঞান, কর্ম ও উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা (এলেম, আমল, এখলাস)। উদ্দেশ্যের প্রকৃত বিশুদ্ধতা সুফি আউলিয়াগণের তরিকায় সমর্পিত হওয়া ব্যতিরেকে অর্জন অসম্ভব। এ ধারায় মহানতম বরং এ সময়ের একমাত্র গ্রহণীয় তরিকাই হচ্ছে খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকা। আমরা এ সম্পদের দিকেই আহবান জানাই। দেশবাসীকে। বিশ্ববাসীকে।

প্রকৃত মানুষের উপাধি মুসলমান। নিরাপোষ নবী হজরত ইব্রাহিম আ. বিশ্বাসী বান্দাগণকে এ নামেই অতিভুষিত করেছেন। অথচ এ নামের উপাধি ধারণকারীরা আজ মার খাচ্ছে সারা পৃথিবীতে। নেতারা হয়েছে অথর্ব। অকর্মণ্য জনতা। ক্যানো? কী কারণে ঐতিহ্যচ্যুত হয়েছে এরা। বিশ্বাসের বিকৃতি অশোধনীয় ব্যাপার। অথচ তাই হয়েছে কেউ কেউ। হয়েছে কাদিয়ানি, মওদুদী, শিয়া, বাহাই। বাকীরা অজ্ঞ, অকর্মণ্য, অশুদ্ধ, বে- এলেম,

বে-আমল, এখলাসহীন। জ্ঞানের অভাব। তার চেয়ে বেশী অভাব কর্মের। তারো চেয়ে বেশী শোচনীয় অবস্থা এখলাসের (বিশুদ্ধ নিয়তের)। তাই যারা আলেম এবং যারা আমলদার তারাও দুর্বল। কাপুরুষ। অশুদ্ধ পাত্রে রক্ষিত বিশুদ্ধ বস্তু। অপবিত্র অন্তরধারীর মগজে কোরআন হাদিস। আত্মম্ভরী নামাজীর সৎকর্মে কি লাভ? হিংসুক, লোভী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থবাদী মুসলমানের চিৎকার, হৈচৈ, মিছিল। কী লাভ এতে? ফিরে এসো মুসলমানেরা। শোনো– রূহানী শক্তিই আসল শক্তি। এ শক্তি যখন ছিলো তখন আমরাই ছিলাম– পৃথিবীপ্রশাসক। শত শত বছর ধরে আমরাই শিখিয়েছি মানবতা। ইউরোপকে। এশিয়াকে। সারাবিশ্বকে।

নবী পাক স. এর খাঁটি উত্তরাধিকারী আউলিয়া কেরামদের পথে এসো। এসো তাঁদের শিক্ষায় অবগাহন করি। অন্তরে স্থাপন করি আল্লাহ্‌পাকের বিরতিহীন জিকির। এ নিয়মেই বিশুদ্ধতার শেষ গন্তব্যের পথে চলো এগিয়ে যাই। পাপে পোড়া প্রবৃত্তিকে করি প্রেমানল। প্রজ্ঞাকাশ। যে মর্যাদা দিয়ে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে– তা তুলে আনি। স্পর্শ করি আমাদের সত্তার প্রকৃত সীমানা। একসাথে দেখি– আমাদের সূচনার চিহ্ন। সমাপ্তির ঝলক।

আলহামদুলিল্লাহ্‌। এলমে মারেফতের এক বিরল গ্রন্থ **‘মাবদা ওয়া মা’আদ’** চতুর্থ বার প্রকাশিত হচ্ছে। এই ধাতব সভ্যতার সময়ে সূচনা ও সমাপ্তির (মাব্‌দা ওয়া মা’আদ) কথা কে শুনতে চায়? কাফের কাদিয়ানি আর শয়তান মওদুদীরা এখন ইসলাম ইসলাম বলে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। অথচ তাদের প্রতি হাদিস শরীফের ঐ বাণী পরিষ্কারভাবে প্রযোজ্য– এক দল লোক আসবে যারা কথায় কথায় কোরআন উদ্ধৃতি দিবে অথচ কোরআনের প্রতিক্রিয়া তাদের হুলকুমের (কণ্ঠনালীর) নিচে নামবে না।

কণ্ঠনালীর নীচে বুক। বুকেই যদি কোরআনের দ্যুতি না পৌঁছে, তবে সে কোরআন পড়ে কি প্রয়োজন? সেই কোরআন চর্চার নামে ‘মওদুদী গবেষণা কেন্দ্র’ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেই বা কি লাভ। জড়বাদী মওদুদীর মাথায় ছিলো কোরআন। বুকে ছিলো শয়তানের বাসা। তাই সে ইবলিসের মতই আল্লাহ্‌প্রেমিকগণকে (নবী, রসুল, সাহাবা, আউলিয়া) যাচাই বাছাই করার সাহস পেয়েছে। বলেছে, ইসলামের শাশ্বত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। বলেছে– নবীরা নিষ্পাপ নয়। সাহাবারা সত্যের মাপকাঠি নয় ইত্যাদি। আল্লাহ্‌পাক কাদিয়ানি ও মওদুদী শয়তানদেরকে নিশ্চিহ্ন করুন। আমিন।

আলহামদুলিল্লাহ্‌। আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ এজন্যে যে, মানুষের বুকের রহস্য উন্মোচনের (এলমে মারেফতের) একটি দুর্লভ গ্রন্থের প্রকাশনায় চতুর্থ বার উদ্যোগী থাকার সুযোগ পেয়েছি। প্রশংসা সমস্তই প্রভু পরোয়ারদিগার আল্লাহ্‌তায়ালার। সকল দরূদ ও সালাম মহানবী মোহাম্মদ স. এর প্রতি। তাঁর অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি। সাহাবা সমাজ, আহলে বায়েত এবং আউলিয়াগণের প্রতি। আমিন।

ওয়াস্‌ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খুত্‌বাহ—এক

আমি আদি ও অন্তে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ক'রছি এবং তাঁর হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আ'লায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বুজুর্গ আওলাদদের উপরও দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

হাম্‌দ ও সালাতের পর আরয হচ্ছে– এই গ্রন্থটি ফযীলতপূর্ণ গ্রন্থ, যা সূক্ষ্ম ও উঁচু স্তরের গোপন তথ্যে ভরপুর। এই গ্রন্থের রচয়িতা– একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম, বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র দলিল স্বরূপ, আক্‌তাব ও আওতাদদের পথ প্রদর্শক, আব্‌দাল ও আফরাদদের লক্ষ্যস্থল, সুরা ফাতিহার গোপন তত্ত্ব ও তথ্যের সঠিক বর্ণনাকারী, হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি, আল্‌-উত্তায়সী, আর-রহমানী, আল্‌-আরিফির রব্বানী, ইসলাম ও মুসলমানদের শায়েখ এবং আমাদের নেতা ও শায়েখ আহমদ আল্‌ ফারূকী, যিনি হানাফী মজহাবভুক্ত এবং নকশ্‌বন্দ তরীকার অনুসারী।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হেদায়েতের সূর্যকে সদা সর্বদা সমুন্নত রাখুন এবং জনগণ তাঁর ফয়েয ও বরকতের ফল্গুধারায় সতত স্নাত হোক। আল্লাহ্‌ই একমাত্র সাহায্যকারী এবং ভরসা কেবল তাঁরই উপর।

(এখানে স্মর্তব্য যে, উপরোক্ত খুত্‌বার ন্যায় লাহোরের 'ইদারায়ে সা'দিয়ায়ে মোজাদ্দেদিয়াতে প্রাপ্ত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির নোটে মাব্‌দা' ওয়া মা'আদের সংকলক হজরত মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক বাদাখ্‌শীর র. আরো একটি ভূমিকা সংযুক্ত আছে, যার অর্থ এখানে উদ্ধৃত করা হ'লো)

খুত্‌বাহ—দুই

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি আমার উপর অশেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে দ্বীন ইসলামের হেদায়েত দিয়েছেন এবং আমাকে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আ'লায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাম্‌দ ও সালাতের পর নিবেদনঃ কিছু উঁচু স্তরের মারেফাতরাজী, যা শ্রেষ্ঠ ইমাম, আওলীয়া ও আস্‌ফীয়াদের পথপ্রদর্শক, আক্‌তাব ও আব্‌দালের কিব্‌লাহ, আফ্‌রাদগণের প্রতিপালনকারী, আমাদের শায়েখ এবং ইমাম– হজরত শায়েখ আহমদ ফারূকী নক্‌শবন্দী র. (আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ছায়াকে সত্যের অনুসন্ধানকারীদের মস্তকের উপর সুবিস্তৃত করুন) এর জীবনী থেকে আহরণ করা হয়েছে। যা আমার মতো নগণ্য, ঐ মহান দরবারের খাদেম মোহম্মদ সিদ্দীক বাদাখ্‌শী একত্রিত করেছে। আশা রাখি যে, এই কেতাব 'মারেফাতের প্রকৃত পথে বিচরণকারী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপকারে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী এর দ্বারা উপকৃত হবেন। তুমি যা বর্ণনা ক'রছো– আল্লাহ্‌ তাতে সাহায্য করুন। (আমিন)।

মিন্‌হা—এক

'জয্‌বা[১] ও সুলূক[২]ঃ যখন এই দরবেশের অন্তরে সুলূকের রাস্তায় চলার ইচ্ছা প্রবল হ'লো, তখন হক তায়া'লা জাল্লা সুলতানুহু তাঁকে নক্‌শবন্দীয়া তরীকার এক বুজুর্গের (কাদ্দাসাল্লাহু তায়া'লা আস্‌রারাহুম) খেদমতে পৌঁছিয়ে দেন। আর সেখান থেকেই আমি এই বুজুর্গদের তরীকা আহরণ করি এবং তাঁর সোহবত (সংসর্গ)

১। জয্‌বা – আত্মিক আকর্ষণ-যা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণই অনুভব করতে পারেন।

২। সুলূক– আল্লাহ্‌ প্রাপ্তির আত্মিকপথ।

অবলম্বন করি। ঐ বুজুর্গের তাওয়াজ্জুহের বরকতে, নক্শবন্দ তরীকার খাজেগানদের জয্বা যা ফানার মাকামে 'সিফাত'[১] সমূহের মূলতত্ত্বে মিলিত হ'য়েছে— হাসিল হয় এবং অন্য তরীকার শেষবস্তু, যা নকশ্বন্দীয়া তরীকার বুজুর্গগণ প্রারম্ভেই প্রবিষ্ট ক'রেছেন, তার দ্বারা পরিতৃপ্ত হই। যখন এই জয্বা সুদৃঢ় হয়, তখন সুলূকের মধ্যে স্থিরতা আসে এবং আমি এই রাস্তায় হজরত 'আলী কার্রামাল্লাহু তায়া'লা অজ্হাহুর রূহানী প্রতিপালনের মাধ্যমে, সর্বশেষ স্থানে উপনীত হই। অর্থাৎ আমার ঊর্ধ্বারোহণ ঐ ইস্ম পর্যন্ত হয়, যা আমার প্রতিপালনকারী। অতঃপর হজরত খাজা নকশ্বন্দ র. এর রূহানী সহায়তায় এই ইস্ম থেকে 'কাবেলিয়াতে উলার' দর্জা পর্যন্ত উন্নীত হই, যাকে 'হাকীকতে মোহাম্মদী' (আলাসাহিবিহাস্ সালাত, ওয়াস্সালাম ওয়াত্তাহিয়্যাতু) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পরে এস্থান থেকে হজরত ফারুক (রাজিয়াল্লাহু আনহুর) রূহানী সাহায্যে আরো উঁচু মাকামে উন্নীত হই। মনে রাখতে হবে যে, এই যোগ্যতা এই মাকামেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং আগের স্তরটি সাধারণ স্তর। এই মাকামকে আক্তাবে মোহাম্মদী বলা হয়। খাতেমুর রসুল সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের রূহানী তরবিয়াতের (প্রতিপালনের) মাধ্যমে এই মাকামে উন্নীত হই। এই মাকামে উপনীত হওয়ার সময় এই দরবেশ, হজরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তারের[২] র. যিনি হজরত খাজা নকশ্বন্দ র. এর খলীফা এবং কুতুবে ইরশাদ[৩] ছিলেন; রূহানী সাহায্যও লাভ করে। এই স্তর কুতুবগণের সর্বশেষ উন্নীত হওয়ার মাকাম এবং দায়েরায়ে যিল্লিয়া (প্রতিবিম্বজাত বৃত্ত) এই মাকামে পৌঁছানোর পর সমাপ্ত হয়। তারপর শুরু হয় নির্ভেজাল আসলের' মাকাম অথবা আসর ও ছায়ার সংমিশ্রণ। আফরাদ্গণের একটি দল এই সম্পদ লাভের যোগ্য। অবশ্য কোনো কোনো কুতুব, আফ্রাদদের সোহবতের কারণে এই বিশেষ মাকামে উন্নীত হয়ে থাকেন এবং আসলকে প্রতিবিম্বমিশ্রিত রূপে অবলোকন করেন। কিন্তু মূল আসলে পৌঁছানো, অথবা মূল আসলকে তার স্তরের পার্থক্য অনুসারে অবলোকন করা, কেবলমাত্র আফ্রাদদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাঁকে চান, তাঁকে এই নেয়ামত দান করন। আর আল্লাহ্ই অনুগ্রহের মালিক।

---

১. আল্লাহ্তায়ালার গুণবাচক নাম। প্রত্যেক মানুষ আল্লাহ্র এক এক সিফাতের মূল থেকে সৃষ্ট। সেইজন্য উক্ত সিফাত–ই তাঁর প্রতিপালনকারী–ইস্ম বা নাম।

২. হজরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তারের আসল নাম- মোহাম্মদ ইব্ন মোহাম্মদ। তিনি হজরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্বন্দ রহ. এর খলীফাদের অন্যতম ছিলেন। হজরত নক্শবন্দ রহ. স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর অনেক মুরীদগণের তরবিয়াতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। তিনি ইল্মে শরীয়তে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং সুন্নতের অনুসরণ ও অনুকরণে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ৮০২ হিজরীতে, ২রা রজব, বুধবার রাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রওজা মোবারক 'মা-অরাউন্নাহার' নামক স্থানের 'জাফানিয়াতে' অবস্থিত।

৩. কুতুবগণের পথ প্রদর্শক।

এই দরবেশ 'আকতাবের' মাকামে উপনীত হলে, সরোয়ারে দীন ও দুনিয়া (আলায়হিস্ সালাত্ ওয়াস্ সালাম) তাঁকে 'কুতুবে ইরশাদের' ভূষণে ভূষিত করেন এবং এই পদে অধিষ্ঠিত করেন।

তারপর আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে আরো উঁচু মাকামে উন্নীত হই এবং এক সময় মিশ্রিত প্রতিবিম্বের আসলে উপনীত হই। এই মাকামেও বিগত মাকামগুলির ন্যায় ফানা ও বাকা (বিলীনত্ব এবং স্থায়ীত্ব) হাসিল হয়। অতঃপর সেখান থেকে আসল মাকামে উন্নীত হয়ে 'আসলের আসল' বা মূলের মূলে উপনীত হই। এই শেষ উরুজের (ঊর্ধ্বারোহণের) সময়, যদ্দ্বারা আসল মাকামে উন্নীত হওয়া বোঝা যায়, আমি হজরত গাওসুল আজম মহীউদ্দীন শায়েখ আব্দুল কাদিরের (কাদ্দাসাল্লাহু তায়ালা সিররুহু) রূহানী মদদ প্রাপ্ত হই, যিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে এই মাকাম অতিক্রম করিয়ে আসলের আসলে বা মূলের মূলে পৌঁছিয়ে দেন। তারপর সেখান থেকে আমাকে দুনিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। ফলে পূর্বেকার মাকামগুলি আবার ফিরে আসতে থাকে।

আর এই দরবেশের নেস্বতে ফরদিয়াত, যা শেষ উরুজের মাকামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সে তার পিতার নিকট থেকে হাসিল করে। আর তাঁর পিতা হাসিল করেন; জয্বা সম্পন্ন, অলৌকিক শক্তির অধিকারী এক বুজুর্গের (হজরত শাহ কামাল র.) কাছ থেকে। কিন্তু নিজের দুর্বল অন্তর্দৃষ্টির কারণে এবং এই নেস্বতের ক্ষীণ প্রকাশের ফলে সুলূকের রাস্তা অতিক্রম করার পূর্বে এই ফকীর উক্ত 'নেস্বত' সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। এমনকি সে আদৌ জানতো না যে, সে ঐ মর্যাদামণ্ডিত নেস্বতের অধিকারী।

বস্তুতঃ এই দরবেশ নফল ইবাদাত করার যোগ্যতা, বিশেষতঃ নফল নামাজ পড়ার অনুমতি, তাঁর পিতার সাহায্যে লাভ করেন। আর তিনি অনুমতি লাভ করেন, তাঁর চিশতীয়া তরীকার শায়েখ হজরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গংগুহী র. এবং তাঁর পুত্র শাহ রুকনুদ্দীনের র. কাছ থেকে।

ইলমে লাদুন্নী লাভঃ বস্তুতঃ এই দরবেশ হজরত খিযির (আলায়হিস সালাত্ ওয়াস্ সালামের) রূহানী সাহায্যে ইলমে লাদুন্নী হাসিল করে। কিন্তু এই অবস্থা ততোদিন বজায় থাকে, যতোদিন না আমি কুতুবদের মাকাম অতিক্রম করি। অতঃপর উক্ত মাকাম অতিক্রম করে উচ্চতর মাকামে উন্নীত হওয়ার পর স্বীয় হাকীকতের মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞানলাভ হতে থাকে। অর্থাৎ স্বীয় সত্তার মধ্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইল্ম বা জ্ঞানলাভ হতে থাকে। এমতাবস্থায় অন্য কোনোকিছুই এই নিয়মের অন্তরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।

নুযুল (অবরোহণ) ও অন্যান্য তরীকার মাশায়েখদের বর্ণনা প্রসংগেঃ এই দরবেশ নুযুলের সময় যা সায়ের আনিল্লাহ বিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র নিকট থেকে সায়ের বা

আত্মিক ভ্রমণ হিসাবে পরিচিত, অন্যান্য তরীকার মাশায়েখদের মাকামসমূহও অতিক্রম করার সৌভাগ্যলাভ করে এবং প্রত্যেক মাকাম থেকে সে প্রচুর ফায়দাপ্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক মাকামের মাশায়েখগণ আমাকে সহযোগিতা করেন এবং স্ব-স্ব নেস্‌বতের সারবস্তু আমাকে প্রদান করেন। সর্বপ্রথম আমি চিশ্‌তীয়া তরীকার সম্মানিত বুজুর্গদের মাকাম অতিক্রম করি এবং সেখান থেকে বহুকিছু হাসিল করি। এই সমস্ত মাশায়েখদের মধ্য থেকে আমি সবচেয়ে বেশী সাহায্য প্রাপ্ত হই, হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন র. এর রূহানী ফয়েয দ্বারা। সত্যকথা এই যে, এই বুজুর্গ এই মাকামের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। বরং এই মাকামের তিনিই নেতা।

অতঃপর আমি কুব্‌রাবীয়া তরীকার বিশিষ্ট বুজুর্গদের মাকাম অতিক্রম করি। চিশ্‌তীয়া ও কুব্‌রাবীয়া মাকাম দুইটি উরুজের হিসাবে সমমর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু নুযুলের সময় উক্ত মাকামটি তরীকতের এই রাজপথের ডানে এবং প্রথমটি এই সিরাতুল মুস্তাকীমের বামপাশে অবস্থিত। আর রাজপথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম তাকেই বলে, যার মাধ্যমে কুতুবদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ফরদিয়াতের মাকাম পর্যন্ত উন্নীত হন এবং অবশেষে নিহায়াতুন নিহায়াহ্ বা চরমপ্রান্তে উপনীত হন। আফ্‌রাদদের চলার পথ স্বতন্ত্র। কুতুব হওয়া ব্যতীত এই রাস্তায় চলা অসম্ভব। উক্ত মাকামটি, মাকামে সিফাত ও উক্ত রাজপথের মধ্যে অবস্থিত। যেন এই মাকামটি, উক্ত দুই মাকামের মধ্যে মিলনক্ষেত্রস্বরূপ, যা দুই দিক থেকে ফয়েয ও বরকত লাভ করে থাকে। আর প্রথম মাকামটি এই রাজপথের অপরদিকে অবস্থিত, যার সঙ্গে মাকামে সিফাতের ক্ষীণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

অতঃপর আমি সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার সম্মানিত বুজুর্গদের মাকাম অতিক্রম করি যার নেতা ছিলেন হজরত শায়েখ শিহাবউদ্দীন (কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম)। এই রাস্তাটি সুন্নতের অনুসরণের নূরে উজ্জ্বল এবং মুশাহিদার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ইবাদতের তওফীক লাভ করা এই মাকামের অনুকূল অবস্থা। কিছু সালেক, যাঁরা এখনো এই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি, অথচ তাঁরা নফল ইবাদতে ব্যস্ত এবং তাতেই সন্তুষ্ট, তারাও এই মাকামের সাথে সম্পর্ক রাখার ফলে, এই মাকামের কিছু অংশ পেয়ে থাকেন। মূলতঃ নফল তাছাড়া অন্যান্যরা চাই তিনি মুব্‌তাদী (প্রারম্ভিক সাধক) হোন অথবা মুন্তাহী (সুলূক সমাপ্তকারী অলি), এই মাকামের সাথে সম্পর্ক রাখা হেতু উক্ত নেয়ামত পেয়ে থাকেন।

আর এই সোহরাওয়ার্দী মাকাম বিস্ময়কর নেয়ামতে পরিপূর্ণ। যে নূর এই মাকামে পরিদৃষ্ট হয়, অন্যান্য মাকামসমূহে তা খুব কমই দেখা যায়। এই মাকামের মাশায়েখগণ রসুলুল্লাহ স. এর পূর্ণ অনুসরণের ফলে অত্যন্ত উচ্চ মর্তবার অধিকারী এবং এই কারণে তাঁরা সমকালীন অন্যান্য তরীকাপন্থী মাশায়েখদের

মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। উক্ত বুজুর্গগণ এই মাকামে যা লাভ করেছেন, তা অন্য কোথাও পান না; যদিও উরুজের দৃষ্টিতে ঐ মাকামগুলি, এই মাকাম থেকে অধিক উন্নত।

অতঃপর আমি জয্‌বার মাকামে অবতরণ করি। এই মাকামটি অসংখ্য প্রকার জয্‌বা দ্বারা পরিপূর্ণ। তৎপর সেখান থেকেও নীচে অবতরণ করি। নীচে অবতরণের সর্বশেষ স্তর মাকামে কলব, যা 'হাকীকতে জামে'আ' বা সমস্ত মূলতত্ত্বে একত্রিতকারী। ইরশাদ ও তাক্‌মীলের দায়িত্ব এই মাকামে অবতরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শেষ পর্যন্ত আমি এই মাকামে অবতরণ করি। এই মাকামে স্থিতিশীল হওয়ার আগেই পুনরায় আমার 'উরুজ নসীব হয়। এই সময় আমি আসলকে ছায়ার ন্যায় পিছনে ফেলে আসি। এই উরুজের ফলে (যা কলবের মাকামে নসীব হয়) আমার পূর্ণ পরিপক্কতা লাভ হয়।

মিন্‌হা—দুই

কুতুবে ইরশাদঃ ঐরূপ কুতুবে ইরশাদ খুব কমই পাওয়া যায়, যিনি ফরদিয়াতের কামালাতেরও অধিকারী। বহুকাল ও শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই এই ধরনের কোনো মুক্তাসদৃশ দুর্লভ ওলী জন্মগ্রহণ করেন। এই অন্ধকার দুনিয়া তাঁর বিকাশের নূরে আলোকিত হয় এবং তাঁর ইরশাদ ও হেদায়েতের নূর সমস্ত পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করে। 'আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত যে কেউ রুশ্‌দ, হেদায়েত, ইমান এবং মারেফাত লাভ করুক না কেনো, তাঁর বদৌলতেই হাসিল করে থাকে এবং তাঁর দ্বারাই উপকৃত হয়। তাঁর মধ্যস্থতা ব্যতীত, কেউই এই সম্পদলাভে সক্ষম হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ তাঁর হেদায়েতের নূর সমস্ত পৃথিবীকে বিশাল বারিধির মতো পরিবেষ্টন করে আছে। আর মনে হয়, সে মহাসমুদ্রটি জমাটবদ্ধ, নিশ্চল। যে কেউ সেই বুজুর্গের প্রতি মনোযোগী হয় এবং তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতা বজায় রাখে, অথবা তিনি যদি কোনো মুরীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন এই তাওয়াজ্জোহের সময় একটি দুয়ার উক্ত মুরীদের অন্তরে খুলে যায় তখন সে মুরীদ

স্বীয় বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও মনোযোগ অনুযায়ী উক্ত পথে মহাসমুদ্রতুল্য বুজুর্গের কাছ থেকে ফয়েয আহরণ করে পরিতৃপ্ত হয়।

একইরূপে, যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল, কিন্তু ঐ বিশিষ্ট বুজুর্গের প্রতি অমনোযোগী, অথচ তাঁর অমনোযোগিতা ঐ বুজুর্গকে অস্বীকার করার ফলে নয়, বরং তাঁকে না জানার কারণে– এমতাবস্থায় সে ব্যক্তিও ফয়েয প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এই ফয়েয প্রাপ্তি, দ্বিতীয় অবস্থার চাইতে প্রথম অবস্থায় অধিক হয়ে থাকে।

কুতুবে ইরশাদের অস্বীকারের ফলঃ অবশ্য যে ব্যক্তি এই বুজুর্গকে অস্বীকার করবে, কিংবা উক্ত বুজুর্গ যার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন; এমতাবস্থায়, সে ব্যক্তি যতোই আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকুক না কেন, সে অবশ্যই প্রকৃত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে। উক্ত কুতুবে ইরশাদকে অস্বীকার করার ফলেই তার ফয়েয প্রাপ্তির রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। চাই তিনি তাকে ফয়েয না পৌঁছানোর ইচ্ছা করেন অথবা তাঁর কোনোরূপ ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন; সে ব্যক্তি কখনোই আসল হেদায়েত পাবে না। সে যা কিছু হাসিল করবে, তা হবে হেদায়েতের বাহ্যিক রূপ মাত্র। হাকীকত ব্যতীত কেবল সুরত বা বাহ্যিকরূপ, মানুষের খুব কমই উপকারে আসে।

কুতুবে ইরশাদের প্রতি ইখলাসঃ আর যারা এঁদের সঙ্গে ইখলাস ও মহব্বত রাখবে, তাঁরা যদি আল্লাহ্‌তায়ালার জিকিরে সব সময় মশগুল নাও থাকে, তবুও তাঁদের প্রতি ভক্তি ও মহব্বত রাখার কারণে তাঁরা রুশ্‌দ ও হেদায়েতের নূর প্রাপ্ত হবে। হেদায়েতের অনুসারীগণের প্রতি সালাম।

মিন্‌হা—তিন

মাকামে তাক্‌মীলঃ সর্বপ্রথম যে দরওয়াজা এই দরবেশের প্রতি উন্মুক্ত হয়, তাতে ছিলো পাওয়ার আকাঙ্খা, প্রাপ্তি নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাপ্তি লাভ হয় এবং পাওয়ার আকাংখা দুরীভূত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে পাওয়ার আকাংখার ন্যায়, প্রাপ্তিও দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায় (প্রাপ্তির মাকাম) মানে বেলায়েতে খাস্‌সা পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কামাল বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির অবস্থা এবং তৃতীয় পর্যায় (পাওয়ার

আকাঙ্খার ন্যায় প্রাপ্তিও দূর হওয়া) তাক্‌মীলের মাকাম, অর্থাৎ দাওয়াত ও ইরশাদের জন্য মাখলুকের প্রতি প্রত্যাবর্তনের মাকাম। প্রথম পর্যায়টি কেবল মাত্র জয্‌বা হিসাবে পূর্ণতা প্রাপ্তি। কিন্তু যখন তার সঙ্গে সুলুকের সমন্বয় ঘটে এবং সালেকের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে, তখন দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় এবং সবশেষে তৃতীয় পর্যায় আসে। কিন্তু ঐ মাজ্‌যুব তিনি সুলূকের ধার ধারেন না, তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় থেকে কোনো উপকারই প্রাপ্ত হন না। সুতরাং নিজে কামেল এবং অন্যকে কামেল বানানোর যোগ্যতাসম্পন্ন মাজযুব তিনিই, যিনি মাজযুব ও সালেক (অর্থাৎ মাজযুব সালেক)। তারপর আসে সালেক মাজযুবের পর্যায়। বর্ণিত দুটি পর্যায়ের কোনোটাই যদি হাসিল না হয়, তবে সে ব্যক্তি নিজে কখনও কামেল হতে পারে না, অন্যকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছাতেও পারে না। কাজেই তুমি ঐ পর্যায়ের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক হজরত খায়রুল বাশার সায়্যেদেনা মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পবিত্র বংশধরদের উপরেও।

মিন্‌হা—চার

নেস্‌বতে নকশ্‌বন্দীঃ রবিউস্‌সানী মাসের শেষের দিকে এই দরবেশ, এই সম্মানিত তরীকার একজন বুজুর্গের (হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ কাদ্দাসা সিররুহু) সান্নিধ্যে আসে– যিনি ছিলেন নকশ্‌বন্দীয়া সিলসিলার একজন খলীফা। এই সম্মানিত তরীকা গ্রহণের পর, সেই বৎসরের রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে নকশ্‌বন্দীয়া তরীকার হুজুরী (অন্যান্য তরীকার শেষের বস্তু, এই তরীকার প্রারম্ভে প্রবিষ্টকরণ) আমার লাভ হয়। ঐ বুজুর্গ (খাজা সাহেব) বলেনঃ নেস্‌বতে নকশ্‌বন্দী আসলে 'হুজুরী কলব' (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণে অন্তর ধ্যানমগ্ন থাকা)। পূর্ণ দশ বৎসর কয়েকমাস অতিবাহিত হওয়ার পর যিল্‌কদ মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হুজুরী, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অবস্থায় অসংখ্য পর্দার অন্তরাল থেকে দৃষ্টিগোচর হতো, উক্ত পর্দাসমূহ বিদীর্ণ হয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলো।

তখন এরকম স্পষ্ট ধারণা হয় যে, প্রথম অবস্থায় যে তাজাল্লী দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো, তা ছিলো উক্ত ইস্‌ম বা নামের বাহ্যিক কাঠামো বা খোলস মাত্র। এই দুইটির (আদি ও অন্তের) মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রকৃত অবস্থা এই মাকামে

পৌছানোর পর প্রকাশ পায় এবং এ সম্পর্কিত গুঢ় রহস্যাবলী উদঘাটিত হয়। যিনি এ অবস্থার স্বাদ আস্বাদন করেননি, তিনি এ সম্পর্কে কিছুই উপলব্ধি করতে পারবেন না। হজরত সায়্যেদুল আনাম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

মিন্‌হা—পাঁচ

নেয়ামতের প্রকাশঃ আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীঃ 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা প্রচার করো'। একদিন এই দরবেশ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসে উপবিষ্ট ছিলো এবং নিজের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করছিলো। এই অবস্থা এমন প্রবল আকার ধারণ করলো যে, আমি ফকীরির সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কবিহীন অনুভব করতে থাকি। এমতাবস্থায় এই বক্তব্যঃ 'যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করে দেন' আমাকে অপমানের অবস্থা থেকে উন্নীত করে। তখন আমার অন্তরের মধ্যে এইরূপ আওয়াজ উত্থিত হয়ঃ 'আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। আর কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সকলকেও ক্ষমা করলাম, যারা তোমার অসীলায় আমার কাছে পৌঁছাবে, চাই সে অসীলা কারো মাধ্যমে হোক বা মাধ্যম ছাড়া।' —এই আওয়াজ বারবার অনুরণিত হতে থাকে, শেষে সকল সংশয়ের অবসান ঘটে। এই নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য হক্ তায়ালা সুবহানুহুর অসংখ্য হাম্‌দ ও ছানা (প্রশংসা ও প্রশস্তি)। এই নেয়ামত এমনই, যা পবিত্র এবং বরকতময়। অতঃপর দরূদ ও সালাম তাঁর রসুল ও আমাদের নেতা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপরও। অবশেষে এই ঘটনা প্রকাশ করার জন্য আমার প্রতি হুকুম হলো।

বাদশাহ্ যদি আসে কভু কুটিরে বৃদ্ধার.
কারণ কি তাতে হে খাজা, তোমার গোস্বার?

নিশ্চয় তোমার রব অতি বড় ক্ষমাশীল।

মিন্‌হা—ছয়

<u>সায়ের ইলাল্লাহ্ঃ</u> সায়ের ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দিকে ভ্রমণ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার নামসমূহের মধ্যে ঐ ইস্‌ম বা নাম পর্যন্ত সায়ের করা, যা ঐ সালেকের মাব্‌দায়ে তা'আয়উন বা নির্ধারিত প্রাথমিক অবস্থা। সায়ের ফিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র মধ্যে (আত্মিক) ভ্রমণ– অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার নামসমূহের মধ্যে এমন ইস্‌ম বা নামের মধ্যে সায়ের করা, যা যাতে আহদীয়া বা নিছক যাতের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং আস্‌মা[১] সিফাত[২] শুয়ুন ও ই'তিবারাত[৩] থেকে মুজাররাদ বা শূন্য। এই ব্যাখ্যাটি তখনই সঠিক বিবেচিত হবে, যখন মোবারক ইস্‌ম আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দ্বারা এমন বিশেষ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা হবে, যা সমস্ত আস্‌মা ও সিফাতের একত্রিতকারী। কিন্তু এই মোবারক ইস্‌মটির অর্থ যদি কেবলমাত্র 'আল্লাহ্‌র যাত' হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তখন 'সায়ের ফিল্লাহ' সায়ের ইলাল্লাহের মধ্যে পরিগণিত হবে।

<u>সায়ের 'আনিল্লাহ বিল্লাহ' বা আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকে সায়েরঃ</u> যেহেতু এই সায়ের বা ভ্রমণ নিছক যাতের মধ্যে এবং এখানে সর্বশেষ বিন্দু হিসাবে কিছুই কল্পনা করা যায় না। বরং উক্ত বিন্দুতে উপনীত হয়ে, সেখানে স্থায়ী না থেকে দুনিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়— এই জন্য এই সায়েরকে সায়ের 'আনিল্লাহ বিল্লাহ্' বা আল্লাহ্ হতে প্রত্যাবর্তন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এটি এমন একটি মারেফাত বা গোপন ভেদ, যা কেবল ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যারা সর্বশেষ মাকাম বা বিন্দুতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। এই দরবেশ ব্যতীত, আল্লাহ্‌র অন্য কোনো ওলীরা, এই মারেফাত সম্পর্কে মুখ খোলেননি। আল্লাহ্ যাকে চান, নিজের জন্য বেছে নেন। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র, যিনি রব্বুল আলামীন এবং সালাম ও সালাত্ সায়্যেদুল মুরসালীন মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সমস্ত পরিবার পরিজনদের উপর।

---

১. আল্লাহ্‌তায়ালার নামসমূহ, ২. আল্লাহ্‌তায়ালার গুণবাচক নাম, ৩. আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর মূল।

মিন্‌হা—সাত

<u>কামালাতে বেলায়েতঃ</u> কামালাতে বেলায়েত মাকামের সায়ের বা ভ্রমণের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। অনেকে এমন হন যে, তিনি বেলায়েতের স্তরগুলি থেকে, মাত্র একটি স্তর হাসিলের ক্ষমতা রাখেন। কিছু লোক এমন থাকেন, যারা দুটি স্তর হাসিলের যোগ্যতা রাখেন এবং কিছু লোক তিনটি স্তরও লাভের ক্ষমতা রাখেন। একটি সম্প্রদায় এমনও আছেন, যারা চারটি স্তর হাসিলের যোগ্যতা রাখেন এবং এমন কিছু লোক আছেন, যাদের মধ্যে পাঁচটি স্তর হাসিলের যোগ্যতা আছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

এই পাঁচটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরটি হাসিলের সম্পর্ক হলো তাজাল্লীয়ে আফ'আল বা আল্লাহ্‌তায়ালার দৈনন্দিন পার্থিব কার্যকলাপ সুসম্পন্ন করার শক্তি প্রকাশের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্তরটি লাভের সম্পর্ক হলো— তাজাল্লীয়ে সিফাত বা আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর আবির্ভাবসমূহের প্রকাশস্থলের সঙ্গে এবং অবশিষ্ট তিনটি স্তর হাসিলের সম্পর্ক হলো, তাজাল্লীয়ে যাতি বা মূল সত্ত্বার আবির্ভাবস্থলের সঙ্গে, যার বিভিন্ন স্তর আছে।

এই দরবেশের অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব তৃতীয় স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। এমন কিছু লোক আছেন, যারা চতুর্থ স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এবং তাদের চেয়ে কম, অতি অল্পসংখ্যক এমন লোক আছেন, যারা পঞ্চম স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এবং এই স্তর বেলায়েত মাকামের সর্বশেষ স্তর। এই দরবেশের কাছে যে কামালাত বা পূর্ণতাটি গ্রহণীয়, তা এই সমস্ত স্তরেরও পরে। সাহাবায়ে কেরামদের পরে এই কামালাতের প্রকাশ লাভ আর ঘটেনি, যা জয্‌বা ও সুলূকেরও ঊর্ধ্বে। ভবিষ্যতে এই কামালাতের প্রকাশ হজরত ইমাম মেহেদীর মধ্যে ঘটবে— ইনশাআল্লাহ্‌। শ্রেষ্ঠতম মানুষের প্রতি সালাত ও সালাম।

মিন্‌হা-আট

নুযুলের সর্বশেষ পূর্ণতাঃ নিহায়েতুন্নিহায়েত্ বা সর্বশেষ বিন্দু বা মাকাম হাসিলকারী ওলী, পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পথে সর্ব নিম্নস্তর বা মাকামে অবতরণ করেন। পূর্ণতার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানো তখনই সঠিক হয়, যখন তার অবতরণও হয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যখন নুযুল বা অবতরণ অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি একান্তভাবে দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী হন। এমন হয় না যে, প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তির কিছু অংশ আল্লাহ্‌র দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ থাকে এবং বাকী অংশ মাখলুক বা সৃষ্টিজগতের দিকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তি পূর্ণতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়নি; কাজেই সে সর্বনিম্নে অবতরণেও পূর্ণতা হাসিল করেনি।

এখানে আসল ব্যাপার এই যে, নামায আদায়ের সময়— যা মু'মিনের জন্য মি'রাজ সদৃশ, অবতরণকারী ব্যক্তির লতীফাগুলি বিশেষভাবে আল্লাহ্ জাল্লা সুল্‌তানুহুর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ থাকে। আবার নামাজ থেকে ফারেগ বা মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সে পরিপূর্ণরূপে মাখ্‌লুকের প্রতি মনোযোগী হয়। অবশ্য ফরয ও সুন্নত নামাজ আদায়ের সময় অবতরণকারীর ছয়টি লতীফা আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ থাকে এবং নফল নামায আদায়ের সময়, উক্ত লতীফাগুলির শ্রেষ্ঠতম লতীফাটি আল্লাহ্‌র দিকে মুতাওয়াজ্জাহ্ থাকে। হাদীস শরীফে আছেঃ 'আল্লাহ্‌র সাথে আমার মিলনের একটি বিশেষ সময় আছে'। সম্ভবতঃ এর দ্বারা ঐ বিশেষ সময়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যা কেবলমাত্র নামাযের জন্য বিশিষ্ট। এই ইংগিতের সপক্ষে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ 'আমার চক্ষুর শীতলতা নামাযের মধ্যেই। এই ইংগিত ব্যতীত, সহীহ কাশ্‌ফ ও স্পষ্ট ইল্‌হামও এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এই মারেফাতটি, এই দরবেশের বিশেষ বিশেষ মারেফাতের অন্যতম। তরীকতের মাশায়েখগণ এই বিষয়কে দুইদিকে মনোসংযোগস্থল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সমস্ত কর্মকাণ্ডই আল্লাহ্‌তে সমর্পিত। তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক— যাঁরা

হেদায়েতের অনুসারী এবং রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের অনুগামী। মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর পবিত্র দরূদ ও সালাম।

মিন্‌হা—নয়

মুশাহিদাঃ মাশায়েখগণ বলেছেন, বেলায়েতের দর্জায় পৌঁছানোর পর আহ্‌লুল্লাহদের দর্শন নফসের মধ্যে হয়ে থাকে। স্বীয় নফসের বাইরের দর্শন, যা 'সায়ের ইলাল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র দিকে সায়েরের সময় পথিমধ্যে প্রকাশিত হয়, সে অবস্থা ধর্তব্য নয়। এই দরবেশের উপর যা প্রকাশিত হয়েছে, তা হচ্ছেঃ স্বীয় নফসের মুশাহিদা বা দর্শন, নফসের বাইরের মুশাহিদার ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য নয়, এই জন্য যে, উক্ত মুশাহিদা, প্রকৃতপক্ষে হক সুবহানুহুর মুশাহিদা নয়। কেননা, হক সুব্‌হানুহু তায়া'লা যখন তুলনাহীন এবং রূপ ও বর্ণনাহীন, তখন তিনি কীরূপে তুলনারূপ দর্পনে সীমিত হতে পারেন? যদিও উক্ত দর্পন নফসের মধ্যে অথবা বাইরে থাকে। হক সুব্‌হানুহু তায়ালা না দুনিয়ার মধ্যে এবং না তার বাইরে; না দুনিয়ার সংগে মিলিত এবং না দুনিয়া থেকে আলাদা। আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন না এই দুনিয়ার মধ্যে সম্ভব এবং না এর বাইরে। আর ঐ দর্শন না দুনিয়ার সঙ্গে মিলিত এবং না দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। এই জন্য ঐ দর্শন যা আখেরাতে হবে, জ্ঞানীগণ সে সম্পর্কে বলেছেন যে, ঐ দর্শন বেলা কায়েফ বা প্রকারহীন হবে, যা জ্ঞানবুদ্ধির সীমার বাইরে। আল্লাহ্‌তায়ালা এই গোপন রহস্যকে তাঁর একান্ত প্রিয় বান্দাদের নিকট এই দুনিয়াতে প্রকাশ করেছেন। যদিও তা দর্শন নয়, তথাপিও তা দর্শনের অনুরূপ। এটা সেই মহাসম্পদ, যা সাহাবায়ে কেরাম (রেদ্‌ওয়ানুল্লাহু তায়ালা 'আলায়হিম আজমা'য়ীন) দের যামানার পর খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই নসীব হয়েছে। আজও অনেকে একথা অবাস্তব বলে ধারণা করে এবং অধিকাংশ লোকই একথা গ্রহণ করবে না; তবুও এই ফকীর একথা প্রকাশ করছে। চাই অপরিণামদর্শী লোকেরা একথা কবুল করুক আর নাই-ই করুক। এই পবিত্র নেস্‌বতটি, এই বিশেষত্বের সাথে, আগামীতে হজরত মেহেদী (আলায়হি রেদওয়ানের) সময় প্রকাশিত হবে। ইনশাআল্লাহু তায়ালা। যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং মোস্তফা সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ প্রতিপালনকারী তাদের প্রতি সালাম এবং তাঁর স. পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর সালাম ও রহমত নাযিল হোক।

মিন্‌হা—দশ

সুলূকের প্রারম্ভঃ যখন কোনো তালেব কোনো শায়েখের খেদমতে হাজির হবে, তখন শায়েখের উচিৎ, তাকে ইস্তিখারা করতে বলা। তিন থেকে সাতবার পর্যন্ত ক্রমাগত ইস্তিখারা করাতে হবে। ইস্তিখারা করানোর পর তালেবের মধ্যে যদি কোনোরূপ অস্থিরভাব না দেখা যায়, তখন তার তরবীয়াত বা প্রতিপালনের কাজ শুরু করতে হবে। প্রথমেই তাকে তওবা করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে এবং দুই রাকা'আত তওবার নামায আদায় করতে বলতে হবে। কেননা, তওবা হাসিল ব্যতীত এই পথে অগ্রসর হওয়া আদৌ ফলদায়ক নয়। প্রথমে সংক্ষিপ্ত তওবাকেই যথেষ্ট মনে করবে এবং পূর্ণ তওবাকে আগামী দিনের উপর সোপর্দ করবে। কেননা, আজকাল মানুষের হিম্মত খুবই কম। যদি প্রথমেই মানুষের উপর ব্যাপক তওবা হাসিল করার তক্‌লীফ দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই তা হাসিলের জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। আর সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁর অন্বেষণে ভাটা পড়তে পারে এবং আসল মাকসুদ থেকে সে বিরত থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে, সে ব্যক্তি আসলে ঠিকমত তওবাও করতে পারবে না।

অতঃপর যে তরীকাটি তালেবের যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত মনে হবে, তাকে সেই তরিকায় তা'লীম বা শিক্ষা দিতে হবে। আর যে জিকির তার যোগ্যতানুসারে ভালো মনে হবে, সেই জিকিরেরই তালকীন দিবে এবং তার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। তার হালের বা অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এই রাস্তার আদব ও শর্তগুলি তাঁকে জানাতে হবে। কোরআন, সুন্নাহ্ ও সালফে সালেহীনদের[১] অনুসরণের জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করা চাই। কেননা, এই পায়রবী বা অনুসরণ ব্যতীত কাঙ্খিত বস্তু লাভ করা সম্ভব নয়। তাকে এটাও জানিয়ে দিতে হবে, যে সমস্ত কাশফ[২] এবং অবস্থা সংঘটিত হবে, তা যদি সামান্য পরিমাণ কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত হয়, তবে তার দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবে না; বরং তার থেকে তওবা ও ইস্তিগ্‌ফার করবে। একই সাথে তাকে এই নসীহতও করা প্রয়োজন, যেনো সে নাজাতপ্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের মতানুযায়ী আকীদাগুলি দুরস্ত করে নেয় এবং ফিকাহের জরুরী হুকুম আহকামগুলি

১.পূর্ববর্তী নেক্‌কারগণ, ২. অন্তর চক্ষুদ্বারা অবলোকন।

জেনে নিয়ে তদনুয়ায়ী আমল করে। কেননা, ইতিকাদ বা দৃঢ়বিশ্বাস এবং আমল এই দুইটি ডানা ব্যতীত, এই রাস্তায় ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। এছাড়া আরো তাগিদ করবে, যেন হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে পূর্ণরূপে সর্তকতা অবলম্বন করে। খাদ্য হিসাবে যা মিলবে এবং যেখান থেকে মিলবে— তাই যেনে ভক্ষণ না করে; যতোক্ষণ না সে খাদ্য শরীয়তের স্পষ্ট দলিল অনুসারে হালাল হয়। মূলকথা, সব ব্যাপারে এই আয়াতে কারীমাকে চলার দিশা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌র নির্দেশঃ 'আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদেরকে যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রতিপালন করো এবং যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকো।' (৫৯ঃ৭)

তরীকার অন্বেষণকারীদের হালত দুই ধরনেরঃ হয়তো সে কাশ্‌ফ ও মারেফাতধারী হবে, নয়তো অজ্ঞ ও হতবুদ্ধিসম্পন্ন হবে। কিন্তু সুলূকের রাস্তা অতিক্রম করার পর এবং পর্দাসমূহ অপসারিত হওয়ার পর উভয় দলই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায়। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর ব্যাপারে কোনো দলই বিশেষ মর্যাদার দাবীদার নয়। যেমন, ঐ দুই ব্যক্তি, যারা দূর দূরান্তের রাস্তা অতিক্রম করে কাবা শরীফে পৌঁছায়। এদের মধ্যে একজন রাস্তার পার্শ্বের দর্শনীয় বস্তু দেখতে দেখতে যায় এবং নিজের যোগ্যতানুযায়ী তা অনুধাবন করে এবং দ্বিতীয় জন চোখ বন্ধ করে গমন করে এবং পথিমধ্যেকার কোনো দৃশ্যই অবলোকন করে না। কাবা শরীফে পৌঁছানোর ব্যাপারে এই দুজনই সমান মর্যাদাসম্পন্ন এবং সেখানে পৌঁছানোর ব্যাপারে কেউ কারো চেয়ে অধিক মর্যাদার হকদার নয়। যদিও রাস্তার মঞ্জিলসমূহ চেনা ও দেখার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান, কিন্তু উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর উভয়ের জন্য অজ্ঞতা জরুরী হয়ে পড়ে। কেননা, আল্লাহ্‌র জাত সম্পর্কে পরিচয় লাভ করার অর্থই হলো মারেফাত থেকে অজ্ঞ এবং অক্ষম হওয়া।

সুলূকের মঞ্জিল বা স্তরঃ জানা দরকার যে, সুলূকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করার অর্থই হলো— ১০টি মাকাম বা স্থান[১] অতিক্রম করা। এই দশটি মাকাম অতিক্রম করা তিন প্রকার তাজাল্লী যথা— তাজাল্লীয়ে আফ'আল, তাজাল্লীয় সিফাত ও তাজাল্লীয়ে যাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

---

১. দশটি মাকাম ঃ ১. তওবা-পাপকাজ পরিহার; ২. ইনাবাত-আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন; ৩. জোহদ-কামনা বাসনা পরিত্যাগ; ৪. অরা-আল্লাহ্ ভীতি; ৫. শোকর-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ৬. তাওয়াক্‌কুল-আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা; ৭. তাসলীম– আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ সর্বান্তকরণে গ্রহণ; ৮. রিযা-সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা; ৯. ছবর- বিপদাপদে ধৈর্যধারণ এবং ১০. কানাআত- অল্পে তুষ্ট থাকা।

এই দশটি বিষয়কে ১০টি মাকাম বলা হয়। এই মাকামগুলি দশ লতিফা যথা– কলব, রূহ, সের, খফী, আখফা, নফ্‌স, আব, আতশ, খাক ও বাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত- উক্ত দশ লতিফায় তাজাল্লীয়ে আফ'আল, তাজাল্লীয়ে সিফাত ও তাজাল্লীয়ে যাতের ফয়েজ পতিত হয়ে–উপরোক্ত ১০টি গুণে গুণান্বিত হলে, বেলায়েত বা ওলীত্বের মর্যাদা লাভ হয়।

রিযার মাকাম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মাকাম তাজাল্লীয়ে আফ'আল ও তাজাল্লীয়ে সিফাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। কেবলমাত্র রিযার মাকামটি তাজাল্লীয়ে যাতে হকতায়ালা ও তাকাদ্দাসা এবং মহব্বতে যাতীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো— প্রেমাস্পদের দিক থেকে সুখ বা দুঃখ যাই-ই আসুক না কেনো, প্রেমিকের জন্য উভয়ই সমান। এমতাবস্থায় পূর্ণ রিযা হাসিল হয় এবং অসন্তুষ্টি বিদূরিত হয়ে যায়। একইরূপে, অন্যান্য মাকামের পূর্ণতাপ্রাপ্তি তাজাল্লীয়ে যাতি হাসিল করার পরই সম্ভব। কেননা, পূর্ণ ফানা বা লয় প্রাপ্তি এই তাজাল্লির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুতঃ অবশিষ্ট নয়টি মাকাম তাজাল্লীয়ে আফ'আল ও তাজাল্লীয়ে সিফাতের মধ্যেই হাসিল হয়ে থাকে। যেমন যখন কেউ নিজের ও যাবতীয় বস্তুর উপর হকতায়া'লা সুবহানুহুর কুদরতকে প্রত্যক্ষ করে, তখন সে সাথে সাথেই তওবার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাক্ওয়া বা পরহেজগারী ইখতিয়ার করে। আর আল্লাহ্র কুদরতের উপর ধৈর্য ধারণ করে, অধৈর্য ও অক্ষমতা হতে মুক্তিলাভ করে। আর সে তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, নেয়ামতের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ এবং কিছু দেওয়া ও না দেওয়া একমাত্র তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি শোকরের মাকামে উন্নীত হয় এবং তাওয়াককুলের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্তের অধিকারী হয়। আর যখন হক তায়া'লার করুণা ও মেহেরবানির ফয়েয তার উপর আপতিত হয়, তখন সে রিযার মাকামে প্রবেশ করে। অতঃপর যখন সে আল্লাহ্তায়ালার আজমত ও মহত্বকে অনুধাবন করে, তখন তাঁর দৃষ্টিতে এই দুনিয়াটি হেয় ও নিকৃষ্ট মনে হয়। এমতাবস্থায়, দুনিয়ার প্রতি তার অনুরক্তি হ্রাস পায় এবং কৃচ্ছতা ও জোহদ ইখতিয়ার করে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই মাকামগুলি বিস্তারিতভাবে হাসিল করা সালেক মাজযুবের জন্যই নির্ধারিত। অপরপক্ষে মাজযুব সালেক এই মাকামগুলি সংক্ষেপে অতিক্রম করেন।

কেননা আল্লাহ্র আকর্ষণ তাকে এমনভাবে বিভোর রাখে যে, সে এই মাকামগুলির বিস্তারিত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে না। সে মহব্বতের ছত্রছায়ায় এই মাকামগুলির সারবস্তু ও মঞ্জিলসমূহের পূর্ণতা হাসিল করে, যা বিস্তারিতভাবে অতিক্রমকারীর জন্য লাভ করা সম্ভব হয় না।

হেদায়েতের অনুসারীদের প্রতি সালাম।

মিন্‌হা—এগারো

<u>নফীয়ে কুল্‌ঃ</u> তালেবের জন্য এটা জরুরী যে, সে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সংগে সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার বাতিল মা'বুদসমূহকে নফী বা ধ্বংস করবে এবং প্রকৃত মা'বুদের স্থিতির জন্য তার স্মৃতিপটে যা কিছু উদয় হয়, সে সমস্তকেও বিদূরিত করে কেবলমাত্র হক তাআ'লার মওজুদ থাকাকে যথেষ্ট মনে করবে। এই মাকামে অজুদ বা অস্তিত্বের কোনো সম্ভাবনাই নেই, কাজেই হক তায়া'লার জাতকে অস্তিত্ব ব্যতীতই তালাশ করা দরকার।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল্ জামাআ'তের আলেমগণ কি সুন্দরই না বলেছেনঃ আল্লাহ্‌তায়ালার অজুদ, তাঁর 'যাত' সুব্‌হানুহু ওয়া তায়া'লার উপর অতিরিক্ত। অজুদকে প্রকৃত যাত বলা এবং অজুদের উপর অন্য কোনো বিষয় স্থির না করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শায়েখ আলাউদ্দৌলা[১] বলেছেন, হক জাল্লা শানুহুর দুনিয়া অস্তিত্বের জগতেরও ঊর্ধ্বে, এই ফকীরকে যখন অস্তিত্বের জগতের উপর নেয়া হয় তখন হালের আধিক্যের মধ্যে থাকাবস্থায়ও আমি নিজেকে অনুসরণ জ্ঞানের দ্বারা মুসলিম হিসাবে গণ্য করতে থাকি। মোদ্দা কথা, সম্ভাব্যের ধারণায় যা কিছু আসে, তা সম্ভাবনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং অতি পবিত্র ঐ যাত যিনি মাখলুকের জন্য– স্বকীয় পরিচিতি প্রদানের লক্ষ্যে অক্ষমতা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

<u>একটি সন্দেহের নিরসনঃ</u> এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, এই ফানা ফিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে লয় প্রাপ্তি এবং বাকাবিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র সত্তায় স্থিতি (যা সালেকের চলার পথে পরিদৃষ্ট হয়), এর দ্বারা সম্ভাব্য বস্তু নিশ্চিত হয়ে যায়। কেননা, এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এর দ্বারা হাকীকত বা মূল বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন

---

১. হজরত শায়েখ রুকনুদ্দীন আলাউদ্দৌলা সাম্‌নানী র. এর কুনিয়াত আবুল মুকারাম এবং নাম- আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ। তিনি ৬৫৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৭৩৬ এর ২২ শে রজব মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হিজরী ৬৭৭ সনে, বাগদাদে শায়েখ নুরুদ্দীন আব্দুর রহমানের নিকট মুরীদ হন। দারা শিখ্‌ওয়া তাঁর একটি ছোট্ট গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে শায়েখ তাঁর জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন এবং নিজের ইজ্‌তিহাদের দ্বারা এমন কিছু আকীদা বর্ণনা করেছেন, যা চার ইমামের মজ্‌হাবের খেলাফ বা বিরোধী।

অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, যা আদৌ সম্ভবপর নয়। কাজেই, সম্ভাব্য বস্তু যখন অবশ্যম্ভাবী হতে পারে না, তখন তার জন্য এছাড়া আর কি থাকতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় লাভ সম্পর্কে অক্ষমতা ও অযোগ্যতা প্রকাশ করবে? তাই কোনো কবির ভাষায় ঃ

'আন্‌কা শিকার যায় না করা
জাল তুলে নাও হে শিকারী,
জাল যে পাতে আন্‌কা আশায়
শূন্য হাতে যায় সে ফিরি'।

বুলন্দ হিম্মতের জন্য এরকমই প্রয়োজন যে, হক তায়া'লার যাতের অন্বেষণকারী শেষ পর্যন্ত কিছুই পাবে না এবং তার কোনো নাম নিশানাও প্রকাশ পাবে না। একটি জামাআ'ত এমন আছে, যারা এর ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। তাঁরা হক তায়া'লার যাতকে, স্বীয় অস্তিত্বের অনুরূপ মনে করে এবং তার সাথে সখ্যতা ও একাত্মতা সৃষ্টি করে। তাই কোনো কবির ভাষায়ঃ 'তুমি কোথায় এবং আমি কোথায়– হে আমার প্রভু।'

মিন্‌হা—বারো

<u>**ছয় দিক সম্পর্কেঃ**</u> হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ কাদ্দাসাল্লাহু তায়া'লা সিররুহুল আক্‌দাস বর্ণনা করেছেনঃ প্রত্যেক শায়েখের আয়নার দুইটি দিক আছে, কিন্তু আমার আয়নার ছয়টি দিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত, এই বুজুর্গ খান্দানের কোনো খলীফাই এই পবিত্র কথার ব্যাখ্যা প্রদান করেননি; এমন কি কেউ ইশারা ইংগিতেও কিছু বলেননি। এই নিকৃষ্ট ও নগণ্য ব্যক্তির সাধ্য কি যে, এ কথার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত বর্ণনার জন্য মুখ খোলে?

বস্তুতঃ হক সুব্‌হানুহু তায়া'লা স্বীয় ফযল ও করমের দ্বারা এই গুঢ় রহস্যের কথা এই অধমের নিকট প্রকাশ করেন এবং এর হাকীকত তাঁরই ইচ্ছামতো ব্যক্ত করেন। এই হেতু মনে জাগে যে, এই দুস্প্রাপ্য মোতির বর্ণনা লেখনীর মাধ্যমে পেশ করি। ইস্তিখারা করার পর এই সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, যেন তিনি ত্রুটি হতে হেফাজত করেন এবং বর্ণনার শক্তি দান করেন।

জানা দরকার যে, আয়নার অর্থ হলো আরেফের কলব বা দিল যা রূহ ও নফ্সের মধ্যে একটি বরজখ[১] স্বরূপ। আয়নার দুই দিকেই অর্থ হলো রূহের দিক এবং নফ্সের দিক। কাজেই সালেক যখন কল্বের মাকামে উন্নীত হয়, তখন তার দুই দিকই তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। ঐ দুটি মাকামের সেই সমস্ত জ্ঞান ও মারেফাত— যা কল্বের সাথে সম্পৃক্ত, তার উপর প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে, হজরত খাজা নকশ্বন্দের র. তরীকা এর বিপরীত এক মহাসম্মানিত তরীকা। এই তরীকায় 'শেষ বস্তুকে প্রথমেই' আনা হয়েছে। কাজেই এই তরীকায় কল্বের আয়নায় ছয়টি দিক দেখা যায়। যার বিস্তারিত বিবরণ হলোঃ

এই মহান তরীকার বুজুর্গদের নিকট এই অবস্থা প্রকাশিত হয় যে, ছয়টি লতিফা (অর্থাৎ নফ্স, কল্ব, রূহ, সের, খফী এবং আখফা) এর যা কিছু মানব দেহের মধ্যে মওজুদ এবং তা এককভাবে কল্বের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এই ছয় দিকের দ্বারা ছয় লতীফা অর্থ নেয়া হ'য়েছে।

বস্তুতঃ অন্যান্য সমস্ত তরীকার মাশায়েখদের সায়ের কলবের বহির্ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এই বুজুর্গদের (নক্শবন্দীয়া তরীকার) সায়ের কলবের অভ্যন্তর পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এই সায়েরের মাধ্যমে তাঁরা কলবের মূল থেকে মূলে পৌঁছে থাকেন এবং এই ছয়টি লতীফার যাবতীয় ইল্ম ও মারেফাত কলবের মাকামে প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু এগুলি ঐ ইল্ম ও মারেফাত যা কলবের মাকামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটাই হজরত খাজা নক্শবন্দ কাদ্দাসাল্লাহু তায়া'লা সিররূহু কর্তৃক বর্ণিত মহান বর্ণনা।

এই মাকামে, এই অধমের উপর, ঐ সমস্ত বুজুর্গদের বরকতে বহুকিছু প্রকাশ পেয়েছে এবং বিশদভাবে পর্যালোচনার পর বাস্তব জ্ঞান হাসিল হয়েছে যা এই আয়াতের আলোকে— 'তোমার রবের প্রদত্ত নেয়ামতের কথা বলে দাও' প্রাপ্ত এই অতিরিক্ত কাশফের কিছু রহস্য এবং বাস্তবজ্ঞানের কিছু নমুনা বর্ণনা করছি। ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা এবং বিবরণ প্রদান শক্তি সম্পূর্ণই আল্লাহ্র তরফ থেকে।

<u>কল্বের পাঁচটি স্তর সম্পর্কেঃ</u> প্রকাশ থাকে যে, কল্ব যেমন ছয় লতীফাকে একত্রিত করে; একইভাবে কল্বের–কল্বও এই সমস্ত লতীফার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু কল্বের মধ্যে বৃত্তের সংকীর্ণতা হেতু অথবা অন্য কোনো গোপন রহস্যের কারণে, উল্লেখিত ছয়টি লতীফা থেকে দুটি লতীফা আংশিকভাবে প্রকাশ পায় না। যার একটি লতীফায়ে নফ্স এবং অপরটি লতীফায়ে আখ্ফা।

---

১. দুইটি বিপরীত বস্তুর সম্মিলিত অবস্থা।

এই অবস্থা ঐ কল্‌বেরও যা তৃতীয় স্তরে হয়ে থাকে, যেখানে লতীফায়ে খফীও প্রকাশ পায় না। এই অবস্থা ঐ কল্‌বেরও যা চতুর্থ স্তরে হয়ে থাকে, যেখানে লতীফায়ে সের প্রকাশ পায় না। কিন্তু এই স্তরে লতীফায়ে কল্‌ব এবং লতীফায়ে রূহ্‌ প্রকাশিত হয়ে থাকে। পঞ্চম স্তরে লতীফায়ে রূহও প্রকাশ পায় না। এমতাবস্থায়, কেবলমাত্র কল্‌বই অবশিষ্ট থাকে, যা মূলতঃ অবিমিশ্র এবং সেখানে অন্য কিছু কখনোই গৃহীত হয় না।

এইস্থানে, উচ্চ তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানা দরকার, যাতে ঐ মারেফাতের দ্বারা সর্বশেষ প্রান্ত এবং উদ্দেশ্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানো যায়। কাজেই, আল্লাহ্‌ সুব্‌হানুহু তায়া'লার অনুগ্রহে আমি বলছিঃ যা কিছু এই বিশাল জগতে ব্যাপকভাবে পরিদৃশ্যমান, তার সবকিছুই এই 'ছোট্ট জগতে' সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত। এই 'ছোট্ট জগৎ এর অর্থ— মানবদেহ। কাজেই যখন ছোট্ট জগতের রঙ বিদূরিত করে তাকে আলোকিত করা হয়, তখন তাতে আয়নার মতো ঐ সমস্ত জিনিস প্রকাশিত হয়, যা ব্যাপকভাবে এই 'বিশাল জগতে' দেখা যায়। কেননা, রঙ বিদূরিত হওয়ার কারণে এবং আলোকিত হওয়ার ফলে তার আধারটি প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। কল্‌বেরও ঠিক এমনই অবস্থা, যার সম্পর্ক এই মানবদেহের সঙ্গে সেরূপই, যেরূপ সম্পর্ক আলমে সগীরের সাথে আলমে কবীরের। অর্থাৎ ব্যাপকতা ও সংকীর্ণতার দিক দিয়ে। কাজেই 'আলমে আস্‌গর' বা 'ক্ষুদ্রতম জগৎ' যার নাম হলো– কল্‌বের নাম, যখন তাকে শানিত করা হয় এবং তার উপর আপতিত জুল্‌মাত ও অন্ধকার বিদূরিত করা হয়, তখন তাতে আয়নার ন্যায় ঐ সমস্ত বস্তু প্রতিফলিত হতে থাকে, যা 'আলমে সগীর' বা মানবদেহের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। কল্‌বের কল্‌বের সাথে– কল্‌বের ও ঠিক এই সম্পর্ক। অর্থাৎ তাতেও ব্যাপকতা ও সংকীর্ণতার সম্পর্ক বিদ্যমান। আর কল্‌বের কল্‌বের মধ্যে ব্যাপকতার বা বিস্তৃতির প্রকাশ, কল্‌বের পবিত্রতা ও নূরানীয়াতের কারণে হয়, যদিও তা মূলে খুবই সংকীর্ণ।

ঐ কল্‌বের অবস্থা— যা তৃতীয় স্তরে হয় এবং ঐ কল্‌বেরও যা চতুর্থ স্তরে হয়, ব্যাপকতা ও সংকীর্ণতা এইরূপেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে যা বিস্তৃত হয়, চতুর্থ স্তরে তা সংকীর্ণ হয়ে থাকে। আগের স্তরের বিস্তৃতি, এই দুটি স্তরে তার বিকাশ শানিত ও নূরান্বিত হওয়ার ফলে হাসিল হয়। আর এই অবস্থা ঐ কল্‌বেরও যা পঞ্চম স্তরে হয়। যদিও তা অবিমিশ্র এবং সেখানে অন্যকিছুই গৃহীত হয় না, তবুও পরিপূর্ণ পবিত্রতা হাসিলের পর তার মধ্যে ঐ সমস্ত বস্তু প্রকাশ পেতে থাকে, যা তামাম জাহান অর্থাৎ 'আলমে কবীর', আলমে সগীর' এবং অন্যান্য আলমে বিরাজিত। যেমন আগে আলোচিত হয়েছে।

কাজেই, কল্‌ব (পঞ্চম স্তরে) সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃত এবং অবিমিশ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রশস্ততম। আর ক্ষুদ্রতম হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তমও। দুনিয়াতে কোনো কিছুই কলবের মতো নয়। এই আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ লতীফার সমকক্ষ এমন কিছুই নেই, যদ্‌দ্বারা মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়া'লার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

বস্তুতঃ এই লতীফার মধ্যেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ সুব্‌হানুহু ও তায়া'লার ঐ সমস্ত আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ নিদর্শনাবলী প্রকাশ পায়, যা অন্য মাখ্‌লুকের মধ্যে প্রকাশ পায় না। হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছেঃ 'না আমার আসমান আমাকে ধারণ করতে পারে, না আমার যমীন; কিন্তু আমাকে ধারণ করতে পারে— আমার মু'মিন বান্দার কল্‌ব।'

'আলমে কবীর' বা এই বিশাল জগৎ, যদিও প্রকাশের দিক দিয়ে সবচাইতে প্রশস্ত আয়নাস্বরূপ, তথাপি তার স্বীয় আধিক্যতা ও ব্যাপকতার কারণে— যাতে বারী তায়া'লার সংগে কোনোরূপ সংস্রব নেই; যাঁর মধ্যে কখনো আধিক্যতা বা ব্যাপকতা পাওয়া যায় না। ঐ যাতের সমকক্ষ ঐ বস্তুই হতে পারে, যা সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃততম, অবিমিশ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রশস্ততম এবং ক্ষুদ্রতম হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তমও। যখন এমন কোনো 'আরেফ'— যিনি মারেফাতের পূর্ণ অধিকারী এবং যার শুহুদ বা দর্শনও নির্ভুল— এই মাকামে পৌঁছান, যাঁর অস্তিত্ব দুর্লভ এবং মর্যাদায় যিনি সম্ভ্রান্ত; তখন এই আরেফ সমগ্র জাহান এবং সমস্ত বিকাশমান বস্তুর কল্‌ব বা হৃদয়স্বরূপ হয়ে যান। এইরূপ ব্যক্তিই বেলায়েতে মোহাম্মাদী স. এর সত্যিকার হক্‌দার এবং 'দাওয়াতে মোস্তফার' মর্যাদায় বিভূষিত হন— তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম।

বস্তুতঃ সমস্ত কুতুব, আওতাদ ও আব্‌দাল তাঁর বেলায়েতের বা ওলীত্বের দায়েরা বা বৃত্তের মধ্যে দাখিল হন এবং আফ্‌রাদ এবং আওলীয়াদের সকলেই তাঁর হেদায়েতের আলোকে স্নাত হন। কেননা, এইরূপ ব্যক্তিই রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিসিক্ত হন এবং আল্লাহ্‌র হাবীব সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হেদায়েত থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হন।

এই মহান নেস্‌বত— যা খুব কমই পাওয়া যায়, মুরাদীন বা শেষপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত। মুরীদদের জন্য এই কামালাত হাসিল করা সম্ভব নয়। এটাই মারেফাতের সর্বোচ্চ পূর্ণতা এবং সর্বশেষ স্তর, যার উপর আর কোনো স্তর নেই এবং এর চাইতে অধিক মর্যাদাশালী আল্লাহ্‌র দান আর কিছুই নেই। এই পর্যায়ের কোনো কামেল আরেফ যদি হাজার বৎসর পরেও পাওয়া যায়, তবু তাঁকে গণীমত মনে করতে হবে। তাঁর বরকতই দীর্ঘদিন এবং অধিক সময় জারী থাকে। ইনিই সেই কামেল আরেফ— যার কথাবার্তা প্রতিষেধকতুল্য এবং

যাঁর দৃষ্টি রোগমুক্তির কারণস্বরূপ। হজরত ইমাম মাহ্‌দী এই উত্তম উম্মতের মধ্যে এই মহান নেস্‌বতের সংগে অতিসত্বর আগমন করবেন। এ যে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এই অনুগ্রহ প্রদান করেন; আর আল্লাহ্‌ তো মহান অনুগ্রহকারী।

<u>এই সম্মানিত নেয়ামত হাসিল সম্পর্কেঃ</u> এই সম্মানিত নে'য়ামত সুলূক ও জয্‌বা উভয়পথে বিস্তারিতভাবে হাসিল হয়; যা সম্পুর্ণ ফানা ও পূর্ণ বাকার এক একটি মাকাম পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করার উপর নির্ভরশীল। আর এই অবস্থা সাইয়্যেদুল মোরসালীন, হাবীবে রব্বুল আ'লামীনের পূর্ণ পায়রবী করা ব্যতীত হাসিল করা সম্ভব নয়। তাঁর ও তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি দরূদ ও সালাম। মহান আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি আমাকে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণের তওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ সুবহানুহু তায়া'লার নিকট এই দরখাস্ত, তিনি যেনো আমাকে রসুলেপাক স. এর পরিপূর্ণ পায়রবী করার তওফীক অটুট রাখেন, এর উপর দৃঢ়তা দান করেন এবং তাঁর শরীয়তের উপর অটল থাকার তওফীক নসীব করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ সমস্ত বান্দাদের উপরও রহম করুন, যারা আমার এই দোয়ার উপর আমীন বলে।

এই মা'আরিফ ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গোপন রহস্যের অন্তর্ভুক্ত, যে সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ওলীদের মধ্যে কেউ কিছুই বলেননি এবং সম্মানিত বুজুর্গ ব্যক্তিদের কেউ এদিকে ইংগিতও করেননি। হক সুব্‌হানুহু তায়া'লা তাঁর এই বান্দাকে স্বীয় হাবীবের তোফায়েলে এই গোপন রহস্যাদি প্রকাশের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাই কোনো ফার্সী কবির ভাষায় ঃ

আসে যদি কভু বৃদ্ধার দুয়ারে–সুল্‌তান,
হ'য়োনা তাতে হে খাজা, কভু– পেরেশান।

হক তায়া'লা শানুহুর কবুলিয়ত, কোনো কারণের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং কোনোকিছুর অনুসারীও নয়। বরং তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যেরূপ ইচ্ছা হুকুম দেন। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের দ্বারা খাস্‌ করে নেন এবং তিনি মহান মর্যাদার অধিকারী। আমাদের নেতা হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর দরূদ, সালাম এবং বরকত নাযিল হোক। সমস্ত আম্বীয়া, মুকাররবীন, ফিরিশ্‌তা এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতি মোবারকবাদ। যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসারী।

মিন্‌হা–তেরো

<u>রূহের মাকাম সম্পর্কেঃ</u> রূহ আলমে বেচুঁনী বা দৃষ্টান্তহীন জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। রূহের জন্য লা–মাকান বা কোনো স্থান না হওয়াই বোঝা যায়। যদিও রূহের বেচুঁনী বা দৃষ্টান্তহীন হওয়া, জাতে হক তায়া'লার তুলনায় 'আইনে–চুঁ' বা দৃষ্টান্তের মতো এবং তার লা মাকানী হওয়া হক তায়া'লার নেস্‌বতে, আইন মাকান বা স্থানের মতো। 'আলমে আরওয়াহ', বা রূহের জগত, এই দুনিয়া এবং মর্তবায়ে বেচুঁনী বা দৃষ্টান্তহীন জগতের মাঝে একটি বরজখ বা পর্দাস্বরূপ।

আর এভাবেই 'আলমে আরওয়াহ' বা রূহের জগতের মধ্যে দুইটি রঙ–ই পাওয়া যায়। অবশ্য আলমে–চুঁ' বা দৃষ্টান্তের জগত তাকে দৃষ্টান্তহীন বা বেচুঁ মনে করে। অপরপক্ষে, মর্তবায়ে বেঁচুনী বা দৃষ্টান্তহীন জগতের দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে রূহকে 'আইনে চুঁ বা দৃষ্টান্তের মতো মনে হয়। বস্তুতঃ রূহের এই বরজখ হবার যোগ্যতা, তার স্বভাবসুলভ কারণেই হাসিল হয়েছে।

<u>রূহের অবতরণ সম্পর্কেঃ</u> রূহের সম্পর্ক এই জড়দেহের সংগে হওয়ার পর এবং এই অন্ধকারময় খাঁচায় আবদ্ধ হওয়ার পর– রূহ ঐ বরজখ স্থান থেকে নির্গত হয়ে পূর্ণরূপে এই 'আলমে চুঁ' বা দৃষ্টান্তের জগতে অবতরণ করেছে। ফলে, বে-চুঁনী বা দৃষ্টান্তহীনতার রঙ তার মধ্য থেকে দূরীভূত হয়েছে। তার অবস্থা হারুত এবং মারুত ফিরিশতাদ্বয়ের মতো। বিশেষ কোনো হিক্‌মত ও প্রয়োজনে ফিরিশ্‌তাদের রূহ মনুষ্যত্বের নিম্নস্তরে নেমে আসে। তফ্‌সীরকার ও ঐতিহাসিকদের অভিমত এরকমই।

রূহের আরোহণ সম্পর্কেঃ অতঃপর আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহুর অনুগ্রহে, এই সফরে, এক ধরনের প্রত্যাবর্তন হাসিল হয় এবং এই অবতরণ হতে আরোহণ নসীব হয়। এমতাবস্থায় নফসে জুল্‌মানী বা অন্ধকারময় নফসের এবং বদনে 'আন্‌সারী বা জড়দেহেরও রূহের অনুসরণের ফলে, এক ধরনের 'উরুজ' বা উর্ধারোহণ নসীব হয় এবং তা বিভিন্ন মন্‌জিল অতিক্রম করে। এই সময়, রূহের এই সম্পর্ক এবং তার অবতরণের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এবং নফসে আম্মারা (পাপকর্মে উদ্বুদ্ধ করে যে প্রবৃত্তি) নফসে মুতমাইন্না বা পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত নফসে রূপান্তরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারময় স্থান আলোয় রূপান্তরিত হয়। রূহ যখন তার সফর সম্পন্ন করে

এবং তার অবতরণের উদ্দেশ্য যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন সে স্বীয় বরজখে পৌঁছে যায়। আর এইভাবেই সে স্বীয় সৃষ্টির মূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে, শেষ বিন্দুতে পৌঁছে যায়।

বস্তুতঃ কল্‌বও 'আলমে আরওয়াহ্ বা রূহের জগতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, তার অবস্থানও 'আলমে বরজখে।'

বস্তুতঃ নফ্‌সে মুতমাইন্না বা প্রশান্ত নফ্‌স, যার উপর আলমে আমর বা সূক্ষ্মজগতের একটি রঙ আছে, তা কল্‌ব এবং দেহের মধ্যে একটি বরজখ স্বরূপ; তার অবস্থানের স্থানও একই, কিন্তু জড়দেহ, যা চারটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) তার অবস্থান এই সৃ' জগতের সঙ্গে; যা অনুসরণ ও ইবাদতে লিপ্ত হয়।

নফ্‌সে মুতমাইন্না হাসিলের পর, উক্ত নফ্‌সের মধ্যে যদি কোনো অবাধ্যতা ও বিরোধীভাব প্রকাশ পায়, তা, ঐ সমস্ত মৌলিক পদার্থের স্বভাবগত কারণে সৃষ্ট বলে ধারণা করতে হবে। যেমন— আগুনের অংশ স্বভাবগতভাবে বিদ্রোহ ও কলহপ্রিয়। সুযোগমতো সেও ইব্‌লিসের মতো— আমি তার (আদমের আ.) চাইতে শ্রেষ্ঠ— এই কথা উচ্চারণ করে।

প্রকৃতপক্ষে নফ্‌সে মুতমাইন্না বা প্রশান্ত নফ্‌স অবাধ্যতা হতে বিরত থাকে। কেননা, সে হক তায়া'লা জাল্লা শানুহুর প্রতি রাজী বা সন্তুষ্ট এবং হক সুবহানুহুও তার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং, যারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের মধ্যে অবাধ্য আচরণের কোনো অবকাশ নেই। যদি অবাধ্যতা প্রকাশ পায়ই, তবে তা 'কালেব' বা জড়দেহসম্ভূত। এই জন্য সাইয়্যেদুল বাশার সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, জড়দেহবিশিষ্ট এই ইবলিসী–অবাধ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে জিহাদে আকবর বলেছেন। আর তার স. এই বাণীঃ আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গিয়েছে, তার অর্থ– প্রকাশ্য শয়তান, যে নবী পাকের স. সংগী। কিন্তু যে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে, তার অর্থ 'শয়তানে আনফুসী' বা নফ্‌সের শয়তান। যদিও এই শয়তানের শক্তি নষ্ট হয় এবং সে অবাধ্য আচরণ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু যা তার স্বভাবজাত— তা কখনোই বিদূরিত হয় না। যেমন, কোনো কবির ভাষায়–

হাব্‌শীর কালো রং – নিজস্ব তাহার
কখনো কি দূর হয় – আশ্চর্য ব্যাপার।

এও হতে পারে যে, শয়তানের অর্থ 'শয়তানে আনফুসী' বা আভ্যন্তরীণ শয়তান। কিন্তু তার ইসলাম কবুল করা মানে এই নয় যে, তাঁর মধ্যে বিরুদ্ধাচরণের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না। তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি

কেউ কষ্টসাধ্য আমলের পথ পরিহার করে এবং সহজসাধ্য আমলের পথ অনুসরণ করে— তা অবশ্যই সম্ভব। যদি ঐ ব্যক্তির দ্বারা কোনো সগীরা গুনাহ্ অনুষ্ঠিত হয়— তাও সম্ভব। বস্তুতঃ নেক্‌কার লোকদের নেকী, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য বদী বা গোনাহের পর্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত বিরুদ্ধাচরণের শামিল। তাঁর মধ্যে বিরুদ্ধাচরণের শক্তি অবশিষ্ট থাকা তাঁর ইস্‌লাহ বা সংশোধন এবং উন্নতির জন্যই।

কেননা, এই অবস্থা অর্জনের পর ঐ ব্যক্তির জন্য এমন লজ্জা, অনুশোচনা, তওবা ও ইস্তিগফার নসীব হয়, যা তাঁর অশেষ উন্নতির কারণ হয়ে থাকে।

তারপর যখন জড়দেহ স্বীয় মাকামে স্থিতি লাভ করে, তখন ছয় লতীফা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলমে আমর বা সূক্ষ্মজগতে আরোহণ করা সত্ত্বেও, দুনিয়াতে এই শরীরই তার স্থলাভিসিক্ত থাকে এবং দেহকেই তাদের সকল কাজ সম্পন্ন করতে হয়। পরে যদি কোনো ইলহাম বা ঐশী নির্দেশ আসে, তখন তা এই গোশতের টুকরা অর্থাৎ কল্‌বের প্রতি আসে, যা হাকীকতে জামেআ কলবীয়া হিসাবে খ্যাত। এ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীছে বর্ণিত আছেঃ যে ব্যক্তি ইখ্‌লাসের সাথে চল্লিশ দিন আল্লাহ্ তায়া'লার জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকে, হিকমতের প্রস্রবণসমূহ তার কল্‌ব থেকে উৎসারিত হয়ে জবানে প্রকাশ পেতে থাকে। এ হাদীছে বর্ণিত উক্ত কল্‌বের অর্থ— এই গোশতের টুকরা। আল্লাহ্ সুবহানুহুই এ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত।

অন্যান্য হাদীছেও এ মর্ম পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। যেমন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদঃ 'অবশ্যই আমার কল্‌ব মলিনতায় আচ্ছন্ন হয়'। বস্তুতঃ এই মলিনতা বা কলুষতা ঐ গোশতের টুকরার উপরই পড়ে থাকে। কল্‌বের মূল সত্তার উপর নয়। কেননা তা তো এই মলিনতা ও কলুষতা হতে সম্পুর্ণ মুক্ত।

অন্যান্য হাদীছে কল্‌বের পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। যেমন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ 'মুমিনের কল্‌ব, আল্লাহ রহমানুর রাহীমের অংগুলীসমূহের দুইটি আংগুলের মধ্যে।'

রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেনঃ 'মুমিনের কল্‌ব পাখির ঐ পালকের মতো যা কোনো জংগল বা প্রান্তরে পড়ে থাকে'। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেনঃ 'হে আল্লাহ! হে কল্‌ব সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার কল্‌বকে আপনার অনুসরণ ও অনুকরণের উপর স্থির রাখুন।'

বস্তুতঃ কল্‌বের এই পরিবর্তন ঐ গোশ্‌তের টুকরার জন্য নির্ধারিত। কেননা, তার মূল সত্তার জন্য এই ধরনের পরিবর্তনের খেয়াল আদৌ করা যায় না। যেহেতু তা মুতমাইন বা প্রশান্ত এবং তাতে সুদৃঢ়। হজরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলায়হিস

সালাম যখন কল্‌বের প্রশান্তির জন্য দোয়া করেছিলেন, তখন তারও উদ্দেশ্য ছিলো এই গোশ্‌তের টুকরা; অন্যকিছু নয়। কেননা তাঁর হাকীকি বা মূল কল্‌ব তো ছিলো মুতমাইন বা শান্ত। বরং তাঁর নফ্‌স, তাঁর হাকীকি কল্‌বের অনুশাসনে অবশ্যই প্রশান্ত ছিলো।

আত্তারিফ্‌ গ্রন্থ প্রণেতার বক্তব্য সম্পর্কেঃ সাহেবুল আত্তারিফ[1] কাদ্দাসা সিররুহুল্ আযীয বর্ণনা করেছেনঃ 'ইল্‌হাম ঐ নফ্‌সে মুত্‌মাইন্নার সিফাত বা গুণ, যা কল্‌বের মাকামে উন্নীত হয়। এমতাবস্থায়, সমস্ত রংয়ের মিশ্রণ এবং পরিবর্তন, নফ্‌সে মুতমাইন্নার বা প্রশান্ত নফ্‌সের গুণ হয়।'

'আত্তারিফ' গ্রন্থ প্রণেতার এই উক্তি, যেমন তুমি দেখছো, উপরোক্ত হাদীসের খেলাফ। যদি হজরত শায়েখের এই মাকাম থেকে ঊর্ধ্বারোহণ সম্ভব হতো, যা সম্পর্কে তিনি উক্তি করেছেন, তবে অবশ্যই তিনি হাকীকতে হাল বা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন এবং আমার বক্তব্যের সত্যতা তিনি বুঝতে সক্ষম হতেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাশফ, ইলহাম– নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীছের অনুরূপ হতো।

তুমি আমার বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত আছ যে, এই গোশ্‌তের টুকরা (কল্‌বের হাকীকতে জামেআ') খলীফা বা প্রতিনিধি হয়ে যায় এবং তার উপরেই ইল্‌হাম হয়; আর সে–ই বিভিন্ন হাল বা অবস্থার অধিকারী এবং বিভিন্ন রঙধারী হয়ে যায়। এই সমস্ত কথা গোঁড়া, মূর্খ এবং প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে খুবই অপ্রিয় মনে হয়। আমার জানা নেই, তারা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই হাদীছ সম্পর্কে কি বলবেন 'নিশ্চয় বনী আদমের শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশ্‌ত আছে, যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে এবং যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীর খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো। এই গোশ্‌তের টুকরাটির নাম কল্‌ব।'
এই পবিত্র হাদীছে, রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, দৃঢ়তার সঙ্গে এই গোশ্‌তের টুকরাটিকে কল্‌ব হিসাবে নির্ধারিত করেছেন এবং শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতাকে কল্‌বের সুস্থতা ও অসুস্থতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং কল্‌বে হাকীকি বা প্রকৃত কলবের জন্য যা কিছু সঠিক, তা এই গোশতের টুকরার জন্যও সঠিক। যদিও এই অবস্থা খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

---

১. সোহরাওয়ার্দী সিল্‌সিলার বিশিষ্ট শায়েখ–ওমর শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, স্বীয় চাচা আবু নজীর সোহ্‌রাওয়ার্দীর মুরীদ এবং খলীফা ছিলেন। তিনি ৫২৯ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৬৩২ সনে সেখানেই ইনতিকাল করেন। এই উপমাহাদেশে তাঁহার খলীফা ছিলেন হজরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী র. শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়াদীর গ্রন্থ 'আত্তারিফুল মা'আরিফ' তাসাউফের অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত এবং তা সর্বযুগে সমস্ত সূফিয়ায়ে– কিরামের নকট খুবই গ্রহণীয়।

জেনে রাখো! রূহ্ যখন স্বীয় শরীর থেকে ঐ মৃত্যুর দ্বারা, যা প্রচলিত মৃত্যুর আগে সম্পন্ন হয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; তখন 'আরেফে আসেল' বা সাক্ষাৎকারী ওলী স্বীয় রূহকে এইরূপ মনে করে যে, রূহ শরীরের সঙ্গে মিলিত নয় এবং শরীর থেকে পৃথকও নয়; শরীরের মধ্যে প্রবিষ্টও নয় এবং শরীর বহির্ভূতও নয়। আর সে মনে করে যে, রূহের সম্পর্ক স্বীয় শরীরের সাথে অবশ্যই থাকে, যার উদ্দেশ্য হলো— শরীরের সুস্থতা। বরং আরো একটি উদ্দেশ্য থাকে, তা হলো— রূহের পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং এই সম্পর্কটি শরীরের মধ্যে সুস্থতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। যদি এই সম্পর্ক না থাকতো তবে শরীর স্বীয় প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও মূল্যহীন হতো।

যাত পাকের সঙ্গে রূহ ও অন্যান্য লতীফার সম্পর্ক এই ধরনেরই। বস্তুতঃ যাত পাক না 'আলম বা সৃষ্টিজগতের মধ্যে প্রবিষ্ট, না সৃষ্টিজগতের বহির্গত, না সৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত এবং না সৃষ্টি থেকে পৃথক। বরং 'আলম বা সৃষ্টিজগতের সঙ্গে হক তায়া'লা সুব্হানুহুর একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে এবং সে সম্পর্ক হলো— সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা, রূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য ফয়েয প্রদান করা এবং নেয়ামত ও নেককাজের উপযোগী করা।

একটি জিজ্ঞাসা এবং তার জওয়াবঃ যদি তুমি প্রশ্ন করো যে, উলামায়ে আহলে হক বা সত্যের অনুসারী 'আলেমগণ রূহ সম্পর্কে এ ধরনের কোনো কথা বলেননি, বরং এ ধরনের বক্তব্যকে তাঁরা নাজায়েয বলেছেন। আর আপনিও সর্বক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণকে জরুরী মনে করেন। তা সত্ত্বেও আপনার এ ধরনের উক্তির কারণ কি?

<u>এই প্রশ্নের জওয়াবে আমার বক্তব্য হলোঃ</u> এ ধরনের লোক খুব কমই আছেন, যাঁরা রূহের হাকীকত সম্পর্কে অবহিত। নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে, তাঁরা রূহের চরম উৎকর্ষতার প্রকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই বলেন নাই বরং সংক্ষেপে বর্ণনা করাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। সাধারণ লোকদের ভ্রম এবং গুমরাহীতে লিপ্ত হওয়ার আশংকায়, তাঁরা এ প্রসঙ্গ পরিহার করেছেন। কেননা, রূহানী কামালাত (বিশেষ একটি স্তরে) বাহ্যতঃ কামালাতে ওয়াজেবুল ওজুদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এই দুয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, যা উলামায়ে রাসেখ বা দ্বীনের সঠিক জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত আর কেউ জানেন না। এই জন্য তাঁরা সংক্ষেপে বর্ণনা করাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন এবং এর হাকীকত বর্ণনাকারীকে অস্বীকার করা ভালো মনে করেছেন। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বুজুর্গরা এই কামালাতকে অস্বীকার করেননি, যার বর্ণনা আগে করা হয়েছে। এই দুর্বল ব্যক্তি (আমি) রূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্বীয় সহীহ ইলম বা সত্য জ্ঞান এবং কাশফে সুরীহ বা স্পষ্ট কাশফের উপর নির্ভর করে হক সুবহানুহু তায়া'লার সাহায্য ও

সহযোগিতায় এবং তাঁর হাবীব আলায়হিস্ সালাত্ ওয়াস্ সালামের দানে বর্ণনা করেছে। এতদসংগে এই সন্দেহের অবসানও করা হলো, যা এই বিবরণ প্রকাশের রাস্তায় অন্তরায় ছিলো। কাজেই ব্যাপারটি গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করো।

জানা প্রয়োজন যে, শরীর যেমন রূহের দ্বারা প্রচুর উপকার লাভ করে, তদ্রূপ রূহও শরীরের দ্বারা প্রভুত কল্যাণ হাসিল করে থাকে। এই শরীরের মাধ্যমে রূহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী, কথোপকথনকারী এবং শরীরের মধ্যে একটি ভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। যার ফলে, রূহ এমন সব কাজকর্ম নিজেই করে, যা আলমে আজ্সাম বা জড়জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ব্যতীত, রূহের জন্য এটা অসম্ভব।)

আকলে মা'আদ বা পারলৌকিক জ্ঞানঃ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, নফসে মুতমাইন্না বা প্রশান্ত নফ্স আলমে আরওয়াহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আলমে–আজ্সাদ বা জড়জগতে আকল তার খলীফা বা প্রতিনিধি হয় এবং আকলে মা'আদ বা পারলৌকিক জ্ঞান নাম ধারণ করে। এমতাবস্থায় তার যাবতীয় চিন্তা–ভাবনা আখেরাতের জন্য খাস্ হয়ে যায় এবং দুনিয়ার জিন্দেগী অতিবাহিত করার দুশ্চিন্তা থেকে সে মুক্ত হয়। আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে যে নূর তাঁকে প্রদান করা হয় তার সাহায্যে সে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়। এটাই জ্ঞানের চূড়ান্ত মর্তবা।

একটি অভিযোগ এবং তার জওয়াবঃ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো লোক যেনো এখানে এমন প্রশ্ন না করে যে, জ্ঞানের পূর্ণতার শেষ সীমা এটাই হওয়া উচিত যে, সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় বিষয় সম্পর্কে একেবারে সম্পর্করহিত হবে। কেননা, প্রাথমিক পর্যায়ে তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু থাকে কেবলমাত্র হক্ সুব্হানাহু তায়া'লা, দুনিয়া বা আখেরাত নয়।

এর জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, সালেক ফানা ফিল্লাহর মাকামে এই বিস্মৃতি হাসিল করে। কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতার ব্যাপারে যে আলোচনা এখানে করা হচ্ছে, তা ঐ মাকাম থেকে বহু মনযিল ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই মাকামে অজ্ঞতার পর জ্ঞানলাভ হয়, স্থিতিলাভের পর বিচ্ছিন্নতা আসে এবং কুফরে তরীকতের পর (যা সম্মিলনের ক্ষেত্রে হাসিল হয়) হাকীকি বা প্রকৃত ইসলাম হাসিল হয়। বেওকুফ দার্শনিকগণ আকলের মধ্যে চারটি স্তর নির্ধারণ করেছেন এবং তারা জ্ঞানের পূর্ণতার ব্যাপারে একে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। এটা তাদের পরিপূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসুত ধারণা। আকল বা জ্ঞানের মূলতত্ত্ব, তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি সত্ত্বেও জ্ঞান ও কল্পনা দ্বারা হাসিল করা সম্ভবপর নয়। এই মূলতত্ত্ব জানার জন্য এমন সহীহ কাশ্ফ ও স্পষ্ট ইলহামের প্রয়োজন, যা নবুওয়াতের নূরের প্রদীপ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও সালাম সমস্ত নবীদের উপর এবং খাস্ করে তাঁর হাবীবের উপর বর্ষিত হোক।

একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তরঃ যদি কেউ একথা জিজ্ঞাসা করে যে, মাশায়েখরা বলেছেনঃ 'আকল বা জ্ঞান রূহের অনুবাদক' তবে তার প্রকৃত অর্থ কি?

এর উত্তরে আমার বক্তব্য হলোঃ যে ইল্‌ম ও মারেফাত রূহানীভাবে তার উৎস থেকে জারী হয়, কল্‌ব তা গ্রহণ করে— যার সম্পর্ক হলো আলমে আরওয়াহ্ বা রূহের জগতের সঙ্গে। এই কল্‌বের ব্যাখ্যাতা হলো আকল বা জ্ঞান, যে তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার পর ঐ ব্যক্তিদের বোধগম্য করায়— যাদের সম্পর্ক এই জড়জগতের সঙ্গে। কেননা, আকল যদি ব্যাখ্যা না করে, তবে কোনো বিষয় বুঝা মোটেও সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ কল্‌বের গোশ্‌তের টুকরা হাকীকতে জামেআ' কলবীয়া বা কল্‌বের মূলসত্ত্বার একত্রিতকারী। কাজেই, তা-ও আসলের গুণে গুণান্বিত। সেই হেতু তার গ্রহণ ক্ষমতা রূহের ক্ষমতার অনুরূপ এবং তা অনুবাদকের প্রত্যাশী।

প্রকাশ থাকে যে, 'আকলে মা'আদের উপর একটি সময় এমন আসে, যখন তা নফ্‌সে মুত্‌মাইন্নার প্রতিবেশী হতে আগ্রহী হয় এবং এই আগ্রহ এতদূর বেড়ে যায় যে আকলে মাআ'দকে নফ্‌সে মুত্‌মাইন্না মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এমতাবস্থায়, আকলে মাআ'দ শরীরকে শূন্যভাবে পরিত্যাগ করে। তখন জ্ঞানের ও স্মরণের যোগ্যতা (আকলে মাআ'দের পরিবর্তে) এ কলব রূপ গোশতের টুকরার মধ্যে স্থান লাভ করে। এই বর্ণনার মধ্যে তাদের জন্য অবশ্যই নসীহত আছে, যাদের কল্‌ব আছে। এই সময় কল্‌ব স্বীয় ব্যাখ্যাদানকারী হয় এবং আরেফের মুআ'মিলা বা সম্পর্ক শরীরের সংগে হয়। 'আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ'— শরীরের আগুনজাত এই বিদ্রোহী স্বভাবও এই অবস্থায় অনুগত হয়ে যায় এবং হাকীকি ইসলাম লাভ হয়। তখন তার ইবলিসের পোশাক খসে পড়ে এবং তাকে আসল নফ্‌সে মুত্‌মাইন্নার মাকামে পৌঁছানো হয় এবং তার স্থলাভিসিক্ত করা হয়। বস্তুতঃ শরীরের মধ্যে কল্‌বে হাকীকি বা প্রকৃত কলবের খলীফা হয় গোশতের টুকরা কল্‌ব এবং নফ্‌সে মুত্‌মাইন্নার স্থলাভিষিক্ত হয়– আগুনের অংশ। যেমন কোন কবির ভাষায়—

ইশকের পরশ যদি পড়েও তামায়
স্পর্শের কারণে তামা সোনা হ'য়ে যায়।

মানবদেহের দ্বিতীয় অংশ হলো— বাতাস। বাতাসও রূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাজেই, সালেক যখন বাতাসের মাকামে পৌঁছে, তখন সে বাতাসকে হক্ প্রাপ্তি বা খোদাপ্রাপ্তি হিসাবে ধারণা করে এবং সেখানেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন রূহের মাকামেও এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ মুশাহিদা বা দর্শন হাসিল হয়ে থাকে। সালেক এই দর্শনে বিভোর হয়ে যায়। কোনো একজন বুজুর্গ বর্ণনা করেছেনঃ আমি দীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরে রূহকে আল্লাহ্ মনে করে ইবাদত করেছি। অতঃপর এই মাকাম

অতিক্রমের পর, হক বাতিল পার্থক্য ধরা পড়ে। এই বায়ুর অংশ— রূহের মাকামের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকার কারণে শরীরের মধ্যে রূহের স্থলাভিসিক্ত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা রূহের মতো হয়ে যায়।

মানবদেহের তৃতীয় অংশ হলো পানি। পানি 'হকীকতে জামেআ কল্‌বীয়া' বা কল্‌বের মূলসত্তার একত্রিতকারীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্য এর ফয়েয সকল বস্তুর উপর পৌঁছে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার ইরশাদঃ 'আমি পানি হতে প্রত্যেক বস্তুর জীবনদান করেছি।' এর প্রত্যাবর্তনস্থানও হলো— এই কল্‌ব, যা গোশতের টুকরা মাত্র।

মানবদেহের চতুর্থ অংশ হলো মাটি। মাটিই শরীরের প্রধানতম অংশ। স্বীয় সত্তার নীচতা ও হীনতা সত্ত্বেও (যা এর স্বভাবগত) পবিত্রতা হাসিলের পর এটাই এই দেহের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং এর রঙ ধারণ করে। মাটির এই আধিপত্য, এর পরিপূর্ণ আধিক্যের কারণে হয়ে থাকে। কেননা, দেহের প্রতিটি অংশ প্রকৃতপক্ষে মাটিরই অংশ। আর একারণেই, এই পৃথিবী সমস্ত মূল পদার্থ ও নভোমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল এবং এই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল এবং সমস্ত জাহানের কেন্দ্রবিন্দু। এমতাবস্থায় শরীর এর মূল লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং এর জন্য সর্বশেষ বিন্দুতে উরুজ বা ঊর্ধ্বারোহণ এবং নুযুল বা অবতরণ স্থির হয়। এই সময় সে পূর্ণ কামালিয়াত হাসিল করে। এটাই ঐ নেহায়েত বা শেষপ্রান্ত, যা বেদায়েত বা প্রারম্ভের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

<u>ফর্‌ক বা'আদুল জমআ' বা একত্রিত হওয়ার পর বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কেঃ</u> জানা প্রয়োজন যে, যদিও রূহ স্বীয় মর্তবা অনুযায়ী তার অধীনস্থদের সঙ্গে ঊর্ধ্বাগমন দ্বারা নিজের মাকামে পৌঁছে, তথাপি তা দেহের তারবীয়াত বা প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এই দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। তারপর শরীরের কাজ যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তখন রূহ অন্যান্য লতীফা, সের, খফী, আখফা, কল্‌ব নফস এবং আকলসহ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হয় এবং দেহের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। এমতাবস্থায়, শরীর পূর্ণরূপে 'উবুদিয়াত বা দাসত্বের মাকামে পৌঁছে। অবশেষে রূহ স্বীয় মর্তবার সঙ্গে মাকামে শুহুদ বা দর্শনের স্থানে স্থিত হয় এবং আল্লাহ্‌ দর্শন ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্যদিকে, শরীরও পূর্ণরূপে অনুসরণের মাকামে স্থির ও অটল হয়। এই হলো– ফর্‌ক বা' আদুল জামআ'র মাকাম বা একত্রিত হওয়ার পর বিচ্ছিন্নের মাকাম। আল্লাহ সুবহানুহুই কামালাত বা পূর্ণতা প্রদানের মালিক। এই ফকীর এই মাকামে বিশেষভাবে বিচরণ করেছে। এই মাকামে রূহ স্বীয় সমস্ত মর্যাদা সহকারে 'আলমে খালক্‌' বা সৃষ্টিজগতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাতে লোকদিগকে আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহুর দিকে দাওয়াত দিতে পারে। এই সময় রূহ কালেব্‌ বা শরীরের ন্যায় হয়ে

যায় এবং তার অনুসারী হয়। আর অবস্থা এমন হয় যে, যদি শরীর হাজির থাকে তবে রূহও হাজির বা মনোযোগী থাকে এবং শরীর যদি গাফেল থাকে, তবে রূহও গাফেল বা অমনোযোগী থাকে। অবশ্য নামাজ আদায়কালে রূহ স্বীয় সমস্ত মর্তবানুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ বা মনোযোগী হয়, যদিও শরীর গাফেল বা অমনোযোগী থাকে। কেননা, নামাজ তো মুমিনের জন্য মি'রাজস্বরূপ।

দাওয়াতের মাকামঃ স্মর্তব্য যে, (আল্লাহ্র সঙ্গে) মিলিত ব্যক্তির এই প্রত্যাবর্তন, দাওয়াতের জন্য সর্বোত্তম মাকাম। এই গাফ্লত বা অমনোযোগিতা একটি বিরাট জামা'আতের মনোযোগিতার কারণ হয়। গাফেল ব্যক্তিরা এই অমনোযোগিতার হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ। অপরপক্ষে, যারা মনোযোগী, তারা এই রুজু বা প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল নয়। প্রকৃতপক্ষে এই মাকামটি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু বাহ্যতঃ তা নিন্দার যোগ্য বলে মনে হয়। স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। আমি যদি এই গাফ্লাত বা অমনোযোগিতার কামালাত সম্পর্কে বর্ণনা করি, তখন অবশ্য কেউই কখনো মনোযোগী হওয়ার খাহেশ বা আশা করবে না।

এটা সেই গাফ্লাত– যা মানব প্রকৃতিকে ফিরিশতার উপর ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। এটা তো সেই গাফলাত যা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ করেছে। এটা ঐ গাফলাত– যা বেলায়েতের দরজা থেকে নবুয়তের দরজায় পৌঁছে দেয়। আর এটা তো সেই গাফলাত– যা নবুয়ত হতে রেসালাতের দরজায় পৌঁছে দেয়। এটা তো ঐ গাফলাত– যা মানুষের মধ্যে বসবাসকারী আল্লাহ্র ওলীদিগকে নির্জনবাসী ওলীদের উপর শ্রেষ্ঠ করেছে। এটাতো সেই গাফলত যা হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে, হজরত সিদ্দীকে আকবরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। অথচ তাদের অবস্থা ছিলো একটি ঘোড়ার দুইটি কানের মতো। এটা তো সেই গাফলাত যা হুঁশকে বেহুঁশীর উপর প্রাধান্য দেয়। এটা তো সেই গাফলাত– যা নবুওতকে বেলায়েতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিদের খেয়ালের বরখেলাফ এটা ঐ গাফলত– যার কারণে কুতুবে ইরশাদ, কুতুবে আবদালের উপর প্রাধান্য পায়। এটা ঐ গাফলত যা সিদ্দীকে আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কামনা করতেন। যেমন তিনি বলতেন— হায় আক্ষেপ! আমি যদি মোহাম্মদ স. এর একটি ভুল বা বিস্মৃতি সদৃশ হতে পারতাম। এটা সেই গাফলত– যার সামনে মনোযোগিতা, তুচ্ছ খাদেমের মতো। অবশ্যই এটা ঐ গাফলত যা মনজিলে মাকসুদে পৌঁছাবার জন্য অগ্রদূত স্বরূপ। হাঁ, এটা সেই গাফলত– যা বাহ্যতঃ নিন্দনীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্মানিত। অবশ্যই এটা সেই গাফলত যা বিশেষ ব্যক্তিকে, সাধারণ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করে এবং সাধারণ

লোকদের জন্য এই অবস্থা কামালাত প্রাপ্তির রাস্তায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কোনো কবি বলেন, 'বলি যদি ব্যাখ্যা এর হবে যে অনেক।' কম কথায় অনেক কিছু জানা যায়। এক ফোঁটা পানি তো অথৈ সমুদ্রেরই অংশ। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লালত্মাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অধীন।

মিন্হা-চৌদ্দ

<u>সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কেঃ</u> হজরত খাতেমুল মুরসালীন সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, অন্য সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাত্ ওয়াস্ তাস্লীমাতের মধ্যে, তাজাল্লীয়ে যাতির সঙ্গে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন। সমস্ত কামালতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বিশেষ মর্যাদায় বিভূষিত হওয়ার কারণে, তিনি স. বিশেষ সম্মানের অধিকারী। রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণকারী বিশেষ ওলীদের জন্যও এই বিশেষ মাকামে একটি অংশ আছে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যেনো এমন প্রশ্ন না করেন যে, তা হলে তো এই উম্মতের কামেল ওলীগণ সমস্ত আম্বীয়াদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যান এবং এই ধারণা আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার প্রতিকূল। আর এই ফযীলত বা মর্যাদা আংশিকও নয় বরং সার্বিক। কেননা, মানুষের মধ্যে একজনের চেয়ে অন্যজনের মর্যাদা অধিক হওয়া, কেবলমাত্র কুরবে ইলাহী জাল্লা শানুহুর কারণে হয়ে থাকে। এর তুলনায় অন্য সমস্ত মর্যাদা খুবই নগণ্য। এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, 'এই উম্মতের কামেল ওলীগণের এই মাকামে একটি অংশ আছে।' এই উক্তির ফলে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা এই মাকামে পৌঁছেছেন এবং মর্যাদা প্রাপ্তিতো এই মাকামে পৌঁছবার কারণেই হয়ে থাকে। এই উম্মত– যারা খায়রুল উমাম বা সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত– তাদের মধ্যেকার কামেল ওলীদের সর্বশেষ উরুজ বা ঊর্ধ্বারোহণের স্থান আম্বীয়া আলায়হিমুস্ সালামদের পদতলে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত মানুষের মধ্যে, আম্বীয়া আলায়হিমুস সালামদের পরে, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর উরুজের মাকামও কোনো নবীর পদতলে স্থিত, যা সমস্ত আম্বীয়াদের মর্যাদা হতে নিম্নতর।

সমস্ত আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলোঃ এই উম্মতের কামেল অনুসারীগণ এই মাকামের যা ফাওকুল ফাওক বা সর্বোচ্চ কামালাতের মাকামের নীচের মাকামের পূর্ণ অংশ পেয়ে থাকেন। আর এই ফাওকুল্ ফাওকের মাকাম আম্বীয়া আলায়হিমুস্ সালামদের জন্য খাস। খাদেম যেখানেই থাকুক না কেনো, তার নিকট মনিবের উদ্বৃত্ত খাদ্য পৌঁছে থাকে। দূরের খাদেমও মনিবের মাধ্যমে নেয়ামত হাসিল করে থাকে। নিকটের খাদেম খেদমত করা ব্যতীত লাভ করতে সক্ষম হয় না। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

ঐ যে কাফেলা জানি আমি তা–
পৌঁছব না সেথা কভু,
দূর থেকে তার ঢোলের আওয়াজ
যথেষ্ট তো তবু।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো কোনো সময় মুরীদেরা স্বীয় পীর সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করে যে, পীরের মাকামসমূহ হাসিল হওয়ার পর– তার ও তার পীরের স্থান সমপর্যায়ের। কিন্তু এই ব্যাপারে আসল কথা তাই, যা উপরে আলোচিত হয়েছে। সমপর্যায়ের ব্যাপারটি তখনই হতে পারে, যখন মুরীদ পীরের মাকামে পৌঁছায়। ঐ মাকামগুলি হাসিলের উপর তা নির্ভরশীল নয়। কেননা, এই হাসিল তো পীরের তোফায়েলে হয়েছে। এই বক্তব্যে কেউ যেনো এইরূপ ধারণা না করেন যে, মুরীদ কখনোই স্বীয় পীরের বরাবর বা সমান হতে পারেন না। বরং সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া সম্ভব এবং জায়েয এবং এরকম হয়েও থাকে। কিন্তু কোনো মাকাম হাসিল হওয়া এবং সেই মাকামে পৌঁছানো– এতোদুভয়ের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। প্রত্যেক মুরীদ ওই কথা বুঝতে সক্ষম নন। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝবার জন্য কাশফে সহীহ বা সত্য দর্শন এবং ইলহামে সুরীহ বা স্পষ্ট ইলহামের প্রয়োজন। আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়া'লা সত্য কথাকে অন্তরে নিক্ষেপকারী। তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যারা হেদায়েতের অনুসারী।

মিন্‌হা-পনেরো

<u>কোনো হাল আগমনের পর, তা গায়ের হয় কেনো?- সে সম্পর্কেঃ</u> একজন সালেক বা পথিক জিজ্ঞাসা করেছেন, এই রাস্তায় (আল্লাহ্ প্রাপ্তির) চলার সময় একটি হাল বা অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা কিছুদিন বিদ্যমান থাকার পর আবার গায়েব বা অদৃশ্য হয়ে যায়- এর কারণ কি? আবার কিছুদিন পর পূর্বের অবস্থা প্রকাশ পায় এবং পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এরকম যতদিন আল্লাহ্তায়ালা চান- হতে থাকে। (এর কারণ কি?)

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাতটি লতীফা বা সূক্ষ্ম মাকাম আছে এবং প্রত্যেক লতীফার প্রাধান্যের সময় আলাদা আলাদা। আবির্ভূত হাল কোনো একটি সূক্ষ্ম লতীফায় প্রকাশ পায়, পরে উক্ত লতীফার উপর কোনো শক্তিশালী হাল প্রকাশ পেলে সালেকের সার্বিক অবস্থা উক্ত লতীফার রঙে রঞ্জিত হয়ে যায় এবং এই অবস্থা অন্যান্য লতীফার উপরও বিস্তার লাভ করে। যতোক্ষণ উক্ত লতীফার উপর এই অবস্থা স্থির থাকে ততোক্ষণ তার এই হাল থাকে। তারপর যখন উক্ত লতীফার প্রাধান্য শেষ হয়ে যায়, তখন ঐ হালও বিদূরিত হয়। কিছুদিন পরে যদি উক্ত অবস্থা পুণঃ প্রকাশ পায়, তখন দুটি অবস্থা হয়ে থাকে। হয়তো ঐ অবস্থাটি প্রথম লতীফার উপর প্রকাশ পাবে, এ অবস্থায় সালেকের উন্নতির রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং এই দ্বিতীয় লতীফায়ও প্রথম লতীফার মতো অবস্থা প্রকাশ পেতে থাকে। কেননা, উক্ত অবস্থা দূরীভূত হওয়ার পর যদি আবার প্রকাশ পায়, তবে পূর্বের মতো তার দুটি অবস্থা হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা প্রত্যেক লতীফার ব্যাপারে হয়ে থাকে। অতঃপর যদি উক্ত আবির্ভূত অবস্থা সমস্ত লতীফার মধ্যে দৃঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ করে, তখন সালেক হাল থেকে মাকামের দিকে ফিরে যায়, অর্থাৎ সাহেবে হাল বা হালের মালিক থেকে, সাহেবে মাকাম বা মাকামের অধিকারী হয়ে যায় এবং পতন থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়া'লা হাকীকতে হাল বা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক দুই জাহানের সর্দার এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর। আমিন।

মিন্‌হা-ষোল

কোরআনের আয়াতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা সম্পর্কেঃ আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ 'ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ সমস্ত পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে রিযিক আকারে প্রদান করেছি এবং তোমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই ইবাদাতের অভিলাষী হও।'

এ আয়াতের মধ্যে এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, এ শর্তটি (যদি তোমরা একান্ত ভাবে তারই ইবাদতের অভিলাষী হও) এই জন্যই লাগানো হয়েছে, যা খাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে– (অর্থাৎ পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো) অর্থাৎ আমি যে রিযিক তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে সুস্বাদু বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর। তবে তার জন্য শর্ত হলোঃ তোমরা ইবাদাতের জন্য আল্লাহ্‌র জাতকেই নির্ধারিত করবে। আর যদি তোমাদের তরফ হতে এটা সত্য না হয়, বরং যদি তোমরা নিজেদেরকে খেলা ধুলায় লিপ্ত রাখার জন্য, তোমাদের প্রবৃত্তির ইবাদত বা অনুসরণ করো, তবে এ সমস্ত সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করবে না। কেননা এমতাবস্থায় তোমরা রোগগ্রস্ত এবং বাতিনী বা গোপন রোগে আক্রান্ত হবে। আর রিযিক হিসাবে তোমাদের যা দেয়া হয়েছে, এসবের মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলি তোমাদের জন্য ধ্বংসকারী হলাহল বা বিষের ন্যায়। অবশ্য যখন তোমাদের বাতিনী রোগ নিরাময় হবে, তখন তোমাদের জন্য এই সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ করা বৈধ হবে। কাশ্‌শাফ গ্রন্থের প্রণেতা[১] আল্লামা যামাখ্‌শারী 'শোকর' শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ স্থানে তাইয়েবাত্‌ বা পবিত্র শব্দের তাফ্‌সীর মুসতালাজ্জ্‌ত অর্থাৎ সুস্বাদু বস্তু করেছেন।

---

১. আবুল কাসিম মাহমুদ ইবন আমর–যিনি আল্লামা যামাখ্‌শারী সাহেবে কাশশাফ হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এবং দীনের অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ৪৬৭ হিজরীর ২৭শে রজব, খাত্তারযিম নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কায় অবস্থান করে ইলমে দীন শিক্ষা করেন, এ জন্য জারুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী খিতাবে ভূষিত হন। তিনি মুতাযিলা মতাবলম্বী ছিলেন। জানা যায় পরে তিনি সুন্নী মত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাফসীরে কাশ্‌শাফ গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি ৫৩৮ হিজরীর, আরাফার দিন, খাত্তারযিমে জুরজানীয়া নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।

মিন্‌হা–সতেরো

মারেফাত লাভের পর কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষতিকর কি? এ সম্পর্কেঃ কোনো একজন মাশায়েখ বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মারেফাত বা পরিচয় লাভ করেছে, কোনো গুনাহ্‌ তার কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারে না। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলোঃ ঐ ব্যক্তি মারেফাত হাসিলের পূর্বে যে গুনাহ্‌ করেছিলো তা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কেননা ইসলাম কবুলের পূর্বে যে গুনাহ্‌ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, ইসলাম সে সবকে পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। উপরন্তু, সুফীদের তরীকা অনুযায়ী হাকীকি বা প্রকৃত ইসলাম হলো ফানা ও বাকা হাসিলের পর আল্লাহ্‌ সুবহানুহু তায়া'লার মারেফাত বা পরিচয় লাভ করা। বস্তুতঃ এরূপ মারেফাত হাসিল হলে পূর্বের সমস্ত গুনাহ্‌ বিলীন হয়ে যায়।

অবশ্য উপরোক্ত কথার এরকমও অর্থ হতে পারে যে, গুনাহের অর্থ ঐ গুনাহ্‌ই যা মারেফাত লাভের পর সংঘটিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, গুনাহের অর্থ হবে– সগীরা বা ছোট গুনাহ্‌, কবীরা বা বড় গুনাহ্‌ নয়। কেননা আল্লাহ্‌র ওলীগণ কবীরা গুনাহ্‌ হতে মুক্ত। আর সগীরা গুনাহ্‌ এই জন্য ক্ষতিকর নয় যে, আরেফ বা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী ঐ গুনাহে বারবার লিপ্ত হন না এবং কোনোরূপ বিলম্ব ছাড়াই তা থেকে তওবাহ ও ইস্তিগ্‌ফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

অথবা এর অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে, আরেফের দ্বারা কোনোরূপ গুনাহ্‌ই সংঘটিত হয় না। কেননা, যদি গুনাহ্‌ই না হয়, তবে ক্ষতির কোনো আশংকাই থাকে না। কাজেই, এখানে রাজেম (বা আবশ্যিক ব্যাপার)কে উল্লেখ করে, মালজুম (যা অবশ্যই হবে) অর্থ নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অস্বীকারকারীরা উক্ত বক্তব্য থেকে যা ধারণা করেছে তা হলোঃ আরেফের জন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। কেননা গুনাহ্‌ তার কোনো ক্ষতি করে না। এরূপ ধারণা মূলতঃ বাতিল এবং স্পষ্টতঃ যিন্দীকের ন্যায়। এরাই শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দলইতো ক্ষতিগ্রস্ত। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের অন্তরকে হেদায়েত প্রদানের পর বক্রতার দিকে ফিরিয়ে দিয়ো না এবং আমাদের উপর তোমার তরফ থেকে রহমত নাযিল করো। নিশ্চিয় তুমি তো অধিক অনুগ্রহ প্রদানকারী।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রহমত, বরকত এবং সালামত নাযিল করুন আমাদের নেতা হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর।

আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট (যার মাগ্‌ফিরাত বা ক্ষমাপ্রদর্শন খুবই প্রশস্ত) এই আশা রাখি যে, এরূপ আরেফ— যিনি ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হয়েছেন, মারেফাতপ্রাপ্তির পূর্বেকার গুনাহ্ তার কোনো ক্ষতি করবে না। যদি তা অত্যাচার ও বান্দার হক সম্পর্কিত না হয়। কেননা হক সুবহানুহু তায়া'লাই সব কিছুর মালিক এবং বান্দার কল্‌ব তাঁর আংগুলসমূহের দুইটি আংগুলের মধ্যে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা কলবকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। বস্তুতঃ ইসলাম কবুল করার সাথে সাথেই সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক সংক্রান্ত গুনাহ্ মাফ হয় না। কিন্তু হাকীকতে ইসলাম ও তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির ফযীলত এতবেশী যে, যা কখনোই তার বাহ্যিক সুরতে হাসিল হয় না।

মিন্‌হা–আঠারো

ওজুদে বারী তায়া'লা সম্পর্কেঃ হক সুবহানুহু তায়া'লা স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ, ওজুদ বা অস্তিত্বের সঙ্গে নয়। এতদ্ব্যতীত, অন্য প্রাণীসকল ওজুদের সঙ্গে মওজুদ বা বিদ্যমান। এমতাবস্থায় হক তায়া'লার মওজুদ হওয়ার জন্য ওজুদের বা অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজনই হয় না। যদি কেউ বলে, হক তায়া'লার ওজুদ তাঁর যাতের অনুরূপ। এ অবস্থায় ওজুদ অতিরিক্ত নয় এবং এতে অন্যকিছুর মুখাপেক্ষী হওয়া আবশ্যক হয় না। যাতে হক জাল্লা সুলতানুহুর জন্য তাঁর ওজুদ— তাঁর যাতের অনুরূপ সাব্যস্ত করার জন্য উঁচু ধরনের দলিল বা প্রমাণাদি পেশ করার প্রয়োজন হয় এবং এ অবস্থায় আমাদেরকে বিশেষ করে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, তাঁরা ওজুদ বা অস্তিত্বকে যাতের অনুরূপ মনে করেন না, বরং তাঁরা ওজুদকে অতিরিক্ত মনে করেন।

মনে রাখতে হবে যে, যদি আমরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে এমন ওজুদের সঙ্গে মওজুদ মনে করি, যা তাঁর যাতের উপর অতিরিক্ত, তখন ওজুদের এই অতিরিক্ততা একথাই প্রমাণ করে যে, যাতে ওয়াজেবে তায়া'লাা ওয়া তাকাদ্দাসা

অন্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আমরা যদি বলি, আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ বা বিদ্যমান এবং এই ওজুদকে আমরা সাধারণ রূপক হিসাবে গ্রহণ করি, এমতাবস্থায়, সত্যের অনুসারী অধিকাংশ যুক্তিবাদী আলেমদের অভিমত যথার্থ বলেই বিবেচিত হয় এবং মুখাপেক্ষী হওয়ার অভিযোগ যা বিরোধী পক্ষ করে থাকেন— তাও দূরীভূত হয়।

এই বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যে, আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ, কিন্তু এতে ওজুদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই এবং আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ওজুদের সঙ্গে মওজুদ, যদিও এই ওজুদকে তাঁর যাতের অনুরূপ ধারণা করা হয়। এই মারেফাত ঐ বিশেষ ধরনের মারেফাত, যা আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়া'লা আমাকে একান্তভাবে দান করেছেন। এই জন্য আল্লাহ্পাকের শোকর আদায় করছি এবং তাঁর রসুলের উপর দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

মিন্হা–উনিশ

আল্লাহ্তায়ালার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেঃ ওয়াজেবুল ওজুদ তায়া'লা ও তাকাদ্দাসার বৈশিষ্ট্য হলোঃ তিনি স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ বা বিদ্যমান এবং স্বীয় মওজুদ হওয়ার জন্য আদৌ ওজুদের মুখাপেক্ষী নন। চাই আমরা ওজুদকে 'আইনে যাত' বা যাতের অনুরূপ অথবা যাতের উপর অতিরিক্ত যাই বলিনা কেনো। এই দুই অবস্থাতেই অর্থাৎ আইনে যাত বা যাতের উপর অতিরিক্ত এ কথায় ঐ কথাই আসে, যা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা হয়েছে। হক সুবহানুহু তায়া'লার সুন্নত বা নিয়ম এই যে, যা কিছু সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত— তার নমুনা সম্ভাব্যজগতে প্রকাশ করে দেন; চাই তা কেউ জ্ঞাত হোক অথবা না হোক। হক তায়া'লাা 'আলমে ইমকানে' বা সম্ভাব্য জগতে, ওয়াজেবুল ওজুদের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত একটি ওজুদের নমুনা সৃষ্টি করেছেন। কেননা, প্রকৃতপক্ষে ওজুদ যদিও মওজুদ নেই এবং তা মাখলুকাতে ছানীয়া বা দ্বিতীয় সম্ভাবনাসমূহ পর্যায়ের মধ্যে গণ্য, কিন্তু আমরা যদি তার ওজুদকে ফরজ বা অপরিহার্য মনে করি, তবে তিনি স্বীয় অস্তিত্বের দ্বারাই মওজুদ হবেন, অন্য কোনো ওজুদ বা অস্তিত্বের দ্বারা নয়। এ অবস্থা অন্যান্য মওজুদাত বা প্রাণীসমূহের বিপরীত। কেননা, তাদের মওজুদ বা বিদ্যমান থাকার জন্য ওজুদ বা

অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী হতে হয়, তাদের যাত বা সত্তা, তাদের অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ ঐ ওজুদ বা অস্তিত্ব– বস্তুর মওজুদ হওয়ার জন্য লোকেরা যাকে প্রয়োজন মনে করে– যদি মওজুদ বা বিদ্যমান থাকে, তবে তা স্বীয় যাতের বা সত্তার সাথেই মওজুদ থাকবে। ঐ পবিত্র যাত অন্য কোনো ওজুদের মুখাপেক্ষী হবে না। খালেকে মাওজুদাত তায়া'লা ও তাকাদ্দাসা যদি স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ থাকেন এবং কোনো সময়ই ওজুদের মুখাপেক্ষী না হন, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা যদি এ অবস্থাকে অসম্ভব মনে করে, তবে এ নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো।

একটি প্রশ্নঃ যদি কেউ বলে, হুকামা বা জ্ঞানীগণ, আশ্‌আরীয়া বা আবুল হাসান আল্ আশ্‌আরীর অনুসারীগণ এবং কিছু সুফী যারা হকতায়া'লা ওয়া তাকাদ্দাসাকে ওজুদের অনুরূপ বলেছেন, তাঁরা তো তাই বলেছেন, যা আপনি একটু আগে বর্ণনা করেছেন। যা হলো, যাতে হকতায়া'লা ওয়া তাকাদ্দাসা স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ, ওজুদের বা অস্তিত্বের সঙ্গে নয়। একথার অর্থ এই যে, ওয়াজেবুল ওজুদ এমন একটি ওজুদের সঙ্গে মওজুদ বা বিদ্যমান, যা তাঁর যাতের অনুরূপ। আর তা হলো, তিনি স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ, ওজুদের সঙ্গে নয়?

উত্তরঃ এ কথার জবাব এই যে, এই স্বীকৃত সত্যের আলোকে, এ বিষয়ে, আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের অনুসারীদের সঙ্গে কোনো মতপার্থক্যই সৃষ্টি হয় না। বরং এখানে হকের অনুসারীদের এরূপ বলা উচিত ছিলো যে, হকতায়া'লা ওজুদের সঙ্গে মওজুদ, স্বীয় যাতের সঙ্গে মওজুদ নন। (এমতাবস্থায় কিছু মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো) এই স্বীকৃত সত্যের আলোকে, ওজুদ বা অস্তিত্বকে অতিরিক্তভাবে নির্ধারিত করা ঠিক নয়। বস্তুতঃ ওজুদকে অতিরিক্তভাবে নির্ধারণ করার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দুইদলের মতপার্থক্যের কারণ— 'ওজুদের' বা অস্তিত্বের ব্যাপারে নয়, বরং তাঁর গুণের ব্যাপারে যে, গুণাবলী তাঁর যাতের অনুরূপ অথবা যাতের উপর অতিরিক্ত। এখানে দুই দলই একথা মানেন যে, হকতায়া'লা ওজুদের সাথে মওজুদ এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনোরূপ মতপার্থক্য নেই। যদি কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ থাকে, তবে তা হলোঃ এই ওজুদ বা অস্তিত্ব, তাঁর যাতের অনুরূপ, অথবা তাঁর যাতের উপর অতিরিক্ত।

দ্বিতীয় অভিযোগ বা প্রশ্নঃ যদি তারা এইরূপ প্রশ্ন করে, যখন ওয়াজেবুল ওজুদ তায়া'লা ওয়া তাকাদ্দাসা স্বীয় যাতের সাথে মওজুদ, তখন ওয়াজেবে তায়া'লাকে মওজুদ বলার হেতু কি? কেননা, মওজুদ তো ঐ জিনিসকে বলা হয়, যার সাথে ওজুদ বা অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। আর আপনিতো এখানে বলেছেন— আল্লাহ্‌তায়ালার আসলে কোনো ওজুদ বা অস্তিত্বই নেই?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে আমার কথা হচ্ছে এই যে, যার সাথে যাতে ওয়াজেবে তায়া'লা ওয়া তাকাদ্দাসা মওজুদ, এমন কোনো ওজুদ বা অস্তিত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে নেই। কিন্তু এমন অস্তিত্ব, যা রূপক হিসাবে হক তায়া'লা যাত সম্পর্কে বলা হয়, যদি ঐরূপ অস্তিত্বের কারণে ওয়াজেবে তায়া'লাকে মওজুদ বা বিদ্যমান বলা হয়, তবে তা সঠিক হবে। এইরূপ অভিমত পরিহার করা জরুরী নয়।

মিন্‌হা-বিশ

আল্লাহ্‌তায়ালার যাত— মুশাহিদা, রুইয়াত ও খেয়ালে না আসা সম্পর্কেঃ আমরা এমন আল্লাহ্‌র ইবাদাত করি না, যিনি শুহুদ বা দর্শনের আওতায় আসেন, যাকে দেখা যায়, জানা যায় এবং ধারণা ও খেয়ালে যার সংকুলান হয়। কেননা, মাশ্‌হুদ, মারই, মা'লুম, মাওহুম্‌ এবং খেয়ালে আসে এমন জিনিস হলো- পর্যবেক্ষণকারী, দর্শনকারী, জ্ঞাতব্যক্তি, ধারণাকারী, খেয়ালকারীদের মতো মাখ্‌লুক বা সৃষ্ট। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

যে লোক্‌মার সংকুলান হয় না মুখে,
তাই আমি খুঁজছি বার বার।

সায়ের ও সুলুকের উদ্দেশ্য হলোঃ পর্দা বা আবরণ উন্মুক্ত করা। চাই ঐ পর্দা ওজুবী বা অবশ্যম্ভাবী হোক কিম্বা ইম্‌কানী বা সম্ভবপর হোক, যাতে পর্দাহীন অবস্থায় মিলন হতে পারে। এমন নয় যে, মাত্‌লুব বা কাংখিত বস্তু নিজের নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং নিজের অধীনস্থ হবে। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

আন্‌কা শিকার যায় না করা
জাল তুলে নাও- হে শিকারী।
জাল যে পাতে আনকা আশায়
শূন্য হাতে যায় সে ফিরি'।

স্মর্তব্য যে, আখেরাতে রুইয়াত বা আল্লাহ্‌ দর্শন বরহক বা অতীব সত্য। আমরা এ কথায় ইমান বা বিশ্বাস রাখি। কিন্তু তার কাইফিয়াত বা অবস্থা কেমন হবে, তা আমরা বর্ণনা করতে চাই না। কেননা, সাধারণ লোক এ প্রসঙ্গ বুঝতে অক্ষম। অবশ্য বিশেষ ব্যক্তিরা একথা বুঝতে সক্ষম। কেননা, এদের জন্য এই

দুনিয়াতেই ঐ মাকামের একটি হিস্‌সা বা অংশ আছে। যদিও রুইয়াত বা দর্শন হিসাবে তার নামকরণ করা হয় না। তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা হেদায়েতের অনুসরণ করে।

মিন্‌হা–একুশ

দর্শনের আরো ব্যাখ্যা প্রসংগেঃ যা দর্শন ও জ্ঞানের আওতায় আসে–তা মুকাইয়েদ বা শৃংখলিত হয় এবং এটা ইত্‌লাকে মহয বা কেবল ধারণার স্তর থেকেও নিম্নমানের। আসল মাতলুব বা উদ্দেশ্য হলো ওটা, যা সমস্ত রকমের বন্ধন হতে মুক্ত। কাজেই, এই মাতলুব অর্থাৎ যাতে হককে দর্শন ও জ্ঞানের আওতার বাইরে তালাশ করতে হবে। এই বস্তুটি নজরে 'আকল' বা জ্ঞান–দৃষ্টির বাইরে অবস্থিত। কেননা, 'আকল' এমন বস্তুর তালাশকে অসম্ভব মনে করে, যা দর্শন ও জ্ঞানের পরিধির বাইরে অবস্থিত। যেমন কোনো এক কবির ভাষায়ঃ

যবনিকান্তরাল–ভেদ যদি জানতে আশা
পাগল প্রেমিকের কাছে করো জিজ্ঞাসা
কিঞ্চিত পেয়েই যে দরবেশ হয়েছে মাতাল
কেমন করে বুঝবে সে বলো, হকিকত হাল।

মিন্‌হা–বাইশ

ইত্‌লাকে মহয বা শুধুমাত্র ধারণা সম্পর্কেঃ জাতে মতলক বা নিছক যাত স্বীয় ইত্‌লাকে মহযের উপর মওজুদ। তার সঙ্গে কোনোকিছু যুক্ত নয়। বস্তুতঃ তাঁর প্রকাশ মাখ্‌লুক বা সৃষ্টিজীবের আয়নায় হয়ে থাকে। কাজেই তাঁর প্রতিবিম্ব ঐ সমস্ত আয়নার রঙে রঞ্জিত হয় এবং সীমিত মনে হয়। এইরূপে ঐ বিকাশ দর্শন ও

জ্ঞানের আওতায় আসে। সুতরাং দর্শন ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করা, প্রকৃতপক্ষে ঐ মাতলুব বা কাংখিত বস্তুর কোনো একটি প্রতিবিম্বের উপর নির্ভর করার সমতুল্য। কিন্তু যারা অসীম সাহসী এবং উঁচু হিম্মতের অধিকারী, তারা আখরোট ও মনাক্কার দ্বারা সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহ্তায়া'লা বুলন্দ হিম্মতওয়ালা লোকদের ভালোবাসেন। হক তায়া'লা সুব্হানুহু আমাদেরকে সাইয়্যেদুল বাশার আলায়হি ওয়া আলা আলিহি আস্ সালাত্ ওয়াস্ সালামের তোফায়েলে, বুলন্দ হিম্মতওয়ালা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

মিন্হা–তেইশ

ফিরিশতাদের উপর মানুষের ফযীলত সম্পর্কেঃ তরিকতের রাস্তায় চলার প্রথম দিকে এক সময় আমি দেখলাম যে, আমি একটি স্থানে তওয়াফ করছি এবং অন্য একটি জামা'আতও আমার সঙ্গে তওয়াফ করছে। কিন্তু তাদের চলার গতি এতোই মন্থর যে, যখন আমি তওয়াফের একটি চক্র শেষ করছি, তখন তারা মাত্র দুই তিন কদমের দূরত্ব অতিক্রম করছে। এ সময় আমার মনে হয় যে, এ স্থানটি আরশের উপর অবস্থিত এবং তওয়াফকারী এ জামা'আতটি ফিরিশতাদের জামা'আত। আমাদের নবী স. এর উপর এবং তাদের উপর রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক। আর আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের দ্বারা খাস্ করে নেন এবং আল্লাহ্ বড়ই ফযলওয়ালা বা অনুগ্রহকারী।

মিন্হা–চব্বিশ

আল্লাহ্র ওলীগণ মানবীয় গুণের উর্ধ্বে নন– এ সম্পর্কেঃ আল্লাহ্তায়ালার ওলীদের পর্দা এবং আবরণ হলো— তাঁদের মানবীয় গুণাবলী। সব লোকেরা যে সমস্ত জিনিসের মুখাপেক্ষী হয়, তাঁরাও ঐ সব জিনিসের মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী। বেলায়েত বা ওলীত্ব তাঁদের এই সব প্রয়োজন থেকে বেনিয়ায বা অমুখাপেক্ষী

করে না। তাঁদের ক্রোধও অন্যান্যদের ক্রোধের ন্যায় হয়ে থাকে। যখন নবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এইরূপ ইরশাদ করেনঃ আমিও ঐরূপ রাগান্বিত হই, যেমন অন্যান্য লোকেরা রাগান্বিত হয়; তখন আল্লাহ্‌র ওলীগণ এ অবস্থায় কিরূপে মুক্তি পেতে পারেন?

একইভাবে, এই বুজুর্গরা পানাহার, পরিবার পরিজনদের সাথে মেলামেশা, আচার–আচরণের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের মতোই মানুষ। মানবীয় বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁরা সাধারণ মানুষের সমতুল্য। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় নবী আলায়হিমুস্ সালামদের সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ 'আমি তাঁদের শরীরকে এমন বানাইনি, যাতে তাঁরা খাদ্য ভক্ষণ করবে না।' অপরপক্ষে, কাফেররা প্রকাশ্যে এরকম বলতো যে, 'এই রসুলদের কি হয়েছে যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করে এবং বাজারেও চলাফেরা করে?' কাজেই, যাদের দৃষ্টি আহলুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পরিজনের বাহ্যিক দিকে পড়েছে, তারা বঞ্চিত হয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রকাশ্য দর্শন— আবু জেহেল ও আবু লাহাবকে ইসলামের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। তারাই সৌভাগ্যের অধিকারী, যাঁরা আহলুল্লাহদের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না; বরং তাঁদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, ঐ সমস্ত বুজুর্গদের বাতিনী সিফাত বা গোপন গুণাবলী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরা মিশরের নীলনদ সমতুল্য যে, মাহজুবীন্ বা পর্দায় আবরিত ব্যক্তিদের জন্য যে পানি বিপদ সংকুল–তুফান সদৃশ্য এবং মাহ্বুবীন্ বা প্রিয় লোকদের জন্য তাই-ই জীবন দানকারী সলিল।

মানবীয় গুণাবলী বড়ই আশ্চর্য ধরনের। মানবীয় স্বভাব আহলুল্লাহদের মধ্যে যতটুকু প্রকাশ পায়, অন্যদের মধ্যে তা প্রকাশিত হয় না। এর কারণ এই যে, ময়লা এবং আবর্জনা যদি কমও হয়, সেটা সমতল এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। অপরপক্ষে, অসমতল ও অপরিষ্কার স্থানে ময়লা–আবর্জনা যদি অধিকও হয়, তবুও তা দেখা যায় না।

বস্তুতঃ মানবীয় গুণাবলীর অসৎ ও অন্ধকারময় দিকগুলো, সাধারণ লোকদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে এবং শরীরসহ কল্‌ব ও রূহতেও আধিপত্য বিস্তার করে। পক্ষান্তরে, বিশেষ লোকদের মধ্যে এই অন্ধকার, কেবল তাদের শরীর ও নফসের মধ্যে সীমিত থাকে এবং খাস্‌সুল–খাস্ বা বিশিষ্টতর ব্যক্তিদের নফ্‌সও এই জুল্‌মাত বা অন্ধকার হতে বিমুক্ত থাকে। কেবলমাত্র তাঁদের শরীরই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

লক্ষ্যণীয় যে, এই জুল্‌মাত সাধারণ লোকদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে এবং বিশেষ লোকদের জন্য তা পূর্ণতা ও সজীবতার কারণ হয়। বিশেষ ব্যক্তিদের এই অন্ধকার– সাধারণ লোকদের অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত

করে। তাদের কল্‌বসমূহে পবিত্রতা আনে এবং নফ্‌সসমূহকে তায্‌কীয়া বা পরিচ্ছন্নতা প্রদান করে। যদি এই জুল্‌মাত না হতো, তাহলে বিশেষ ব্যক্তিদের সাধারণ লোকদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকতো না এবং ইফাদাহ্‌ বা উপকার দেওয়া ও ইফতিফাদা বা উপকার গ্রহণ করার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতো। আর এই জুল্‌মাত বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে এই পর্যায়ের থাকে না, যা তাদের কলুষিত করে। বরং এই কারণে যে অনুশোচনা ও ইস্তিগ্‌ফার তাঁরা করেন সেটা এমনই হয় যে, যার ফলশ্রুতিতে সমস্ত ময়লা–আবর্জনা দূরীভূত হয়ে যায় এবং আরো অধিক তরক্কী বা উন্নতি লাভ করে। এই জুলমাত বা অন্ধকার ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে নেই। যার ফলে তাঁদের উন্নতির রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একে জুলমাত বলাতো এমনই প্রশংসা— যা দুর্নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বে–খবর সাধারণ লোকেরা, আহলুল্লাহদের মানবীয় গুণাবলীকে, নিজেদের মানবীয় গুণাবলীর মতো মনে করে এবং এই কারণে, তারা বঞ্চিত এবং অপমানিত হয়ে থাকে। অদৃশ্য বস্তুকে দৃশ্যমান মনে করাতেই এই রকম ভুলের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক মাকামের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য হয় এবং প্রত্যেক জায়গার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁরা হেদায়েতের অনুসারী এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে যারা কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে, তাঁদের উপরও শান্তি নাযিল হোক।

মিন্‌হা–পঁচিশ

‘উলুমে ইম্‌কামী এবং মা’আরিফে উজুরী সম্পর্কেঃ মানুষ যতোদিন জ্ঞান বুদ্ধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য রঙে রঞ্জিত থাকে, ততোদিন সে মূল্যহীন থাকে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সবকিছুকে ভুলে যাওয়া, এই রাস্তার জন্য একান্ত আবশ্যক এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সবকিছু ফানা বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া, সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজন। যতক্ষণ না বাতিনী আয়না, ইম্‌কান বা সম্ভাব্যের রঙ ও ময়লা হতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়, ততোদিন তাতে আল্লাহ্‌র প্রকাশ অসম্ভব। কেননা, ‘উলুমে–ইম্‌কানী বা সম্ভাব্য জ্ঞান, মাআরিফে উজুবী বা আল্লাহ্‌ পরিচিতির জ্ঞানের সঙ্গে একত্রিত হওয়া এমনই অবাস্তব এবং অসম্ভব, যেমন দুটি ভিন্নধর্মী বস্তুর একত্রিত হওয়া অসম্ভব।

একটি প্রশ্নঃ এখানে বড় ধরনের একটি প্রশ্ন দেখা দেয় এবং তা হলো— আল্লাহ্‌তায়ালা যখন কোনো আরেফকে বাকার সম্মানে বিভূষিত করার পর, নাকেস্‌ বা অসম্পুর্ণ লোকদের পূর্ণতা প্রদানের জন্য (সম্ভাব্য জগতের দিকে) ফেরত পাঠান, তখন তাঁর যে ‘উলুমে ইম্‌কানী বা সম্ভাব্য জ্ঞান দূরীভূত হয়েছিলো তা পুনরায় ফিরে আসে। এমতাবস্থায়, ‘উলুমে ইম্‌কানী এবং মা’আরিফে উজুবী একত্রিত হয়। অথচ আপনার বর্ণনানুসারে তা দুইটি বিপরীতধর্মী বস্তুর মিলনের মতো।

উত্তরঃ ‘আরেফে বাকী বিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রাপ্ত সাধক, ঐ সময়, যখন সে ইরশাদ ও হেদায়েতের জন্য ‘আলমে ইমকানে প্রত্যাবর্তন করে, তখন বরযখীয়াতের হুকুমসম্পন্ন হয়। এই সময় সে উজুব এবং ইম্‌কানের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনকারী হয়ে দুই মাকামের নূরে রঞ্জিত হয়। এমতাবস্থায়, যদি দুটি মাকামের উলুম এবং মা’আরিফ একত্রিত হয়, তবে তাতে ক্ষতি কি? কেননা, বিপরীত বস্তুসমূহের মিলিত হওয়ার মাকামতো আর এক রইলো না, বরং তা কয়েকটি মাকামে রূপান্তরিত হলো। সুতরাং এটা দুইটি ভিন্নধর্মী বস্তুর মিশ্রণ কিছুতেই নয়।

মিন্‌হা-ছাব্বিশ

<u>ইল্‌মুল আশ্‌ইয়া বা বৈষয়িক জ্ঞানের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কেঃ</u> বস্তুর জ্ঞান, যা ফানার মরতবায় বিদূরিত হয়, যদি তা বাকার স্তরে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তার ফলে আরেফের কামালিয়াতের মধ্যে কোনোরূপ ক্রুটির সৃষ্টি হয় না। বরং এই প্রত্যাবর্তনই তার কামালিয়াত বা পূর্ণতার কারণ হয়। স্মর্তব্য যে, তার পূর্ণতা এই প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভরশীল। কেননা, আরেফ বাকার স্থানে পৌঁছানোর পর, হক তায়া’লার চরিত্রে চরিত্রায়িত হয়। বস্তুসমূহের জ্ঞান আল্লাহতায়া’লার জাতের মধ্যে পরিপূর্ণ এবং তার বিপরীত জ্ঞান ক্ষতির কারণ।

বস্তুতঃ যে ‘আরেফ আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত, এটা তারই অবস্থা। এর মধ্যে হিক্‌মত বা রহস্য এই যে, মুমকেন বা সম্ভাব্যের মধ্যে ইলম হাসিল হওয়ার সূরত এই যে– ‘আলেম বা জ্ঞানীর মস্তিষ্কে মা’লুম বা জানার অবস্থার সৃষ্টি হয়। কাজেই, জ্ঞানীব্যক্তি নিজে, জ্ঞাত বস্তুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পায়,

জ্ঞানী ব্যক্তির উপর তার প্রভাব ততই বেশী হতে থাকে। যার ফলে, ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অধিক হতে পারে; যা তার জন্য ক্ষতিকর। কাজেই, তালেবের বা অন্বেষণকারীর জন্য এটা জরুরী যে, সে এই সমস্ত জ্ঞানকে অস্বীকার করবে এবং সবকিছুকে ভুলে যাবে। কিন্তু জাতে ওয়াজেবে তায়া'লার মধ্যে ইলম বা জ্ঞানের অবস্থা এরূপ নয়। জাতে হক সুবহানুহু এ অবস্থা থেকে পবিত্র যে, তাঁর মধ্যে জ্ঞাত বস্তুর আকৃতি প্রবেশ করবে। বরং হকতায়া'লার জ্ঞানের সম্পর্ক বস্তুর সাথে হওয়ার সাথে সাথে, বস্তুসমূহ নিজেই প্রকাশিত হয়।

পবিত্র ঐ জাত, যিনি বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় যাত, সিফাত ও আফ্‌আল বা কর্মের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তনকে কবুল করেন না। আর যে 'আরেফ আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রায়িত হন, তাঁর জ্ঞানও ঐ ধরনের হয়ে থাকে। এজন্য তাঁর মধ্যে বৈষয়িক জ্ঞানের সুরত প্রবেশ করতে পারে না; কাজেই তা তাঁর মধ্যে কোনোরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। আর এ কারণে তাঁর মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তনও আসে না বা কোনো মিশ্রভাব সংযুক্ত হয় না। কাজেই, এ অবস্থা তার ক্ষতি করে না, বরং পূর্ণতা প্রদান করে। এই হিকমত এবং গোপন তথ্য, আল্লাহতায়ালার গোপন ভেদরাজীর অন্তর্ভূত। হক্ সুবহানুহু তায়া'লা স্বীয় হাবীব আলায়হি ওয়া আলা আলিহীস্ সালাত্ ওয়াস্ সালামের বরকতে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই মর্যাদামণ্ডিত করেন।

মিন্‌হা–সাতাশ

ইত্‌মিনানে নফ্‌সের (প্রশান্ত প্রবৃত্তি লাভের) পরে, মাকামে–রিজা (সন্তুষ্টির স্তর) হাসিল হওয়া সম্পর্কেঃ সুলুকের রাস্তায় কদম রাখার সময় থেকে বারো বৎসর পরে এই ফকীরকে রিয়ার মাকাম দ্বারা সম্মানিত করা হয় এবং নফ্‌সকে ইত্‌মিনান বা প্রশান্তি দান করা হয়। অতঃপর ক্রমাগত আল্লাহ্‌তায়ালার ফযল বা অনুগ্রহে, মাকামে রিযা বা সন্তুষ্টি হাসিল হয়। এই ফকীর ঐ সময় পর্যন্ত এই দৌলত লাভে সক্ষম হয়নি, যতক্ষণ না হক জাল্লা সুলতানুহুর রিযা বা সন্তুষ্টির একটি আক্‌স বা প্রতিবিম্ব আলোকিত হয়ে সামনে আসে। এর পর নফ্‌সে মুত্‌মাইন বা প্রশান্ত নফ্‌স স্বীয় মাওলার প্রতি রাজী হয়ে যায় এবং তার মাওলাও নফ্‌সে মুত্‌মাইনের প্রতি রাজী হয়। এই নেয়ামত লাভের জন্য আমি আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়া'লার হামদ ও ছানা প্রকাশ

করছি— যা পবিত্র এবং বরকতময়। এমন হামদ ও ছানা, যা আমার রব পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। দরূদ এবং সালাম তাঁর রসুল হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বংশধর ও পরিবার পরিজনদের উপর।

একটি প্রশ্নঃ যদি কেউ বলে, যখন নফ্স স্বীয় মাওলার প্রতি রাজী হয়, তখন দোয়া করা এবং বালা মুসীবত দূরীভূত হওয়ার ইচ্ছা করার কারণ কি?

জবাবঃ হক তায়া'লার ফেল বা কর্মে রাজী হওয়ার অর্থ এরকম নয় যে, তাঁর মাখ্লুক বা সৃষ্টবস্তুর প্রতি রাজী হতে হবে বরং অনেক সময় এমন হয় যে, মাখ্লুকের প্রতি রাজী হওয়া যা কুফরী ও গোনাহের সমতুল্য দোষের এবং পাপের কাজ। কাজেই মাখ্লুকের প্রতি রাজী হওয়া দোষের কাজ এবং মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা ওয়াজেব। যখন আল্লাহ তায়া'লা মন্দ কাজের প্রতি সন্তুষ্ট নন, তখন বান্দা কীভাবে তার প্রতি রাজী বা সন্তুষ্ট হতে পারে? বরং এমতাবস্থায় তো বান্দা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়। কাজেই, মাখলুকের প্রতি ঘৃণা পোষণ সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টকর্মের প্রতি রাজী হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

এভাবে ব্যাখ্যার পর, বালা মুসীবত দূরীকরণের জন্য দোয়া করা মুস্তাহসান্ বা উত্তম বলে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে যারা সৃষ্টকর্ম হতে রিযার মধ্যে এবং মাখলুক হতে ঘৃণার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হননি, তারা রিযা হাসিল হওয়ার পরেও ঘৃণা মওজুদ থাকার সন্দেহে আপতিত হয়েছে এবং তা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের আড়ম্বরের আশ্রয় নিয়েছে। বস্তুতঃ তারা এরূপ বলতে বাধ্য হয়েছে যে, ঘৃণাবোধ হওয়া রিযার হালের জন্য ক্ষতিকর, রিযার মাকামের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু ওটাই সত্য কথা, যা আমি আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়া'লার ইলহাম থেকে প্রাপ্ত হয়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছি। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁরা হেদায়েতের অনুসারী।

মিন্হা-আটাশ

ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কেঃ বহুদিন পর্যন্ত আমি এরূপ আকাঙ্খা করছিলাম যে, যদি হানাফী মাজহাবে এমন কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ বেরিয়ে আসতো, যাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া যেতে পারে। কেননা, নামাজের মধ্যে কিরাআত পড়া ফরয। এমতাবস্থায়, হাকীকি কিরাআত পরিত্যাগ করে, হুক্মী কিরাআতের অনুসরণ করা সংগত মনে হয় না। পক্ষান্তরে, নবী করীম

সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদঃ 'সুরা ফাতেহা ব্যতীত কোনো নামাজ নামাজ-ই নয়।' কিন্তু হানাফী মাজহাবের অনুসরণ ও অনুকরণের খাতিরে সুরা ফাতিহা পড়া পরিত্যাগ এবং একে রিয়াযাত এবং মুজাহিদার অনুরূপ মনে করতে থাকি। কেননা, একটি মাজহাব পরিত্যাগ করে অন্য মাজহাবে গমন এক ধরনের ইল্‌হাদ বা অস্বীকার। অবশেষে, হক সুব্‌হানুহু তায়া'লা হানাফী মাজহাবের অনুসরণের বরকতে, ইমামের পিছনে মুক্‌তাদীর কিরাআত না পড়ার ব্যাপারটি আমার নিকট প্রকাশ করেন এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে হুকমী কিরাআত যে হাকিকী কিরাআতের চাইতে উত্তম, একথা বুঝতে পারি। কেননা ইমাম এবং মুকতাদী সবাই সম্মিলিতভাবে মুনাজাতের মাকামে দণ্ডায়মান হন। যেমন বলা হয়, 'অবশ্যই নামাযী স্বীয় রবের সংগে গোপন আলাপ করে।' নামাযের সময় মুকতাদীরা ইমামকে দলপতি হিসাবে নির্বাচিত করে। কাজেই এ সময় ইমাম যা পাঠ করেন, তা সমস্ত কওমের পক্ষ থেকে পাঠ করেন। বিষয়টি এরকম যে, কিছু লোক কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলাপ আলোচনার জন্য, কোনো একজন প্রতিপত্তিশালী বাদশাহের সম্মুখে উপনীত হয় এবং নিজেদের একজনকে দলপতি নির্বাচন করে; যাতে সে তাদের মুখপাত্র হিসাবে বাদশাহের নিকট সবকিছু পেশ করতে পারে। এমতাবস্থায়, দলপতি বক্তব্য পেশের সময়, অন্য কেউ যদি কিছু বলে, তবে তা বেআদবী হিসাবে পরিগণিত হয় এবং বাদশাহের নারাজীর কারণ হতে পারে। কাজেই, এই জামাআতের হুকমী কথাবার্তা, যা তাদের দলপতির মুখ থেকে বের হয়: তা তাদের সকলের হাকীকি কথাবার্তা অপেক্ষা উত্তম। একই অবস্থা ইমামের সঙ্গে মুকতাদীর কিরাআত পাঠ করা। কেননা, এর ফলে হৈচৈ ও চেঁচামেচির সৃষ্টি হয়, যা আদবের খেলাফ এবং একাত্মতার পরিবর্তে বিছিন্নতার সৃষ্টি করে। হানাফী ও শাফী মাজ্‌হাবের অধিকাংশ ইখতিলাফী মাসায়েল বা মতভেদী মাসআলাসমূহ এই ধরনের; যার বাহ্যিক সুরত ইমাম শাফীর দিকে মনে হয়, কিন্তু তার বাতিন বা প্রকৃত অবস্থা হানাফী মাজহাবের অনুরূপ।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই ফকীরের নিকট প্রকাশ করেন যে, 'ইলমে কালাম বা যুক্তিবিদ্যার মধ্যে যে মতভেদ, তার হক বা সত্যটি হানাফী মাজহাবের অনুরূপ। যেমন— হানাফী মাজহাবে তকবীন বা সৃষ্টিকে, সিফাতে হাকীকি বা আসল গুণ হিসাবে গণ্য করা হয়। যদিও বাহ্যতঃ মনে হয়, এটা কোনো হাকীকি সিফাত নয়, বরং এর পরিণতি— কুদরত এবং ইরাদা বা ইচ্ছার সিফাত। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জানা যায় যে, তকবীন প্রকৃতপক্ষে একটি স্থায়ী আলাদা সিফাত বা গুণ। এই নিরীখে অন্যগুলির কিয়াস বা ধারণা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ ফিকাহ্ শাস্ত্রের মধ্যে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তার অধিকাংশ মাসআলা মাসায়েলের সত্যটি হানাফী ফিকাহর অনুকূলে। এমন খুব কম মাস্‌লাই আছে, যাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

মাতুরীদি মতবাদের সংরক্ষণঃ সুলুকের রাস্তায় চলাকালীন সময়ে একদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই ফকীরকে বলেনঃ 'আপনি ইলমে কালামের মুজতাহিদদের মধ্যে একজন।' এ ঘটনার পর থেকে ইলমে কালাম বা যুক্তিবিদ্যার প্রত্যেক মাসআলা মাসায়েলে, আমার একটি বিশেষ অভিমত প্রতিফলিত হতে থাকলো। অধিকাংশ মাসআলা মাসায়েল যন্মধ্যে মাতুরীদিয়া ও আশাইরাহদের মধ্যে মতভেদ আছে, যখন প্রথমে তা সামনে আসে, তখন মনে হয়– হাকীকত আশাইরাহদের অনুকূল। কিন্তু যখন সূক্ষ্মদর্শিতা ও অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে অবলোকন করা হয়, তখন প্রতীয়মান হয় যে, হক বা সত্যটি মাতুরীদিয়াদের অনুকূলে। ইলমে কালামের সমস্ত মতভেদী মাসআলাসমূহে এই ফকীরের অভিমত উলামায়ে মাতুরীদিয়াদের ন্যায়। আর সত্য ব্যাপার এই যে, এই বুজুর্গগণ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ পায়রবী বা অনুসরণের কারণে, এই মহামর্যাদায় বিভূষিত হয়েছেন, যা তাদের বিরোধীদের পক্ষে হাসিল করা সম্ভব হয়নি। কেননা, তাঁরা দার্শনিক দৃষ্টিভংগীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও এই দুটি দলই সত্যের অনুসারী।

ইমাম আ'জমের মহত্ত্বঃ সমস্ত বুজুর্গদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ইমাম ও প্রথম পথ প্রদর্শক— ইমাম আবু হানীফা[১] র. এর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে আমি আর কি লিখব? তিনি সমস্ত মুজতাহিদদের মধ্যে, যথা ইমাম শাফী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর চাইতে অধিক জ্ঞানী, মুত্তাকী এবং আল্লাহভীরু ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফী র. বলেনঃ 'সমস্ত ফিকাহ শাস্ত্রবিদ আলেম আবু হানীফা র. এর বংশধর।'

কথিত আছে যে, যখন ইমাম শাফী র. ইমাম আজম র. এর মাযার যিয়ারতে যেতেন, তখন তিনি নিজের ইজতিহাদ পরিত্যাগ করতেন এবং নিজের রায়ের বা মতের উপর আমল করতেন না। বরং এ সময় তিনি বলতেনঃ 'তাঁর সম্মুখে আমার ঐ মতের উপর আমি আমল করবো যা তাঁর মতের বিপরীত এইরূপ করতে আমার লজ্জাবোধ হয়।' এ সময় তিনি ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতিহা পড়া পরিত্যাগ করতেন এবং ফজরের নামাযে দোয়া কুনুত পড়াও পরিহার করতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বলা যায় যে, ইমাম আবু হানীফা র. এর মর্যাদা, ইমাম শাফী র.-ই

১. তাঁর আসল নাম নু'মান ইব্‌ন ছাবিত। কুনিয়াত আবু হানীফা। ইমাম আ'জম এবং ইমাম সাহেব তাঁর লকব বা উপাধি। তিনি ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫০ হিজরীতে আব্বাসীয় শাসক মনসুরের রাজত্বকালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তাঁর প্রকৃত উস্তাদ ছিলেন ইমাম হাম্মাদ। তিনি ব্যতীত অন্যান্য বুজুর্গ ও তাবেঈনদের নিকট হতে তিনি ফয়েজ হাসিল করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আবু য়ূসুফ র. ইমাম শায়বানী র. এবং ইমাম যাফর র. সমধিক প্রসিদ্ধ। ফিকাহ শাস্ত্রের চারজন প্রসিদ্ধ ইমামের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । সমস্ত ইসলামী দুনিয়াতে, আহলে-সুন্নাহ্–ওয়াল-জামাআতের অনুসারীরা তাঁর অনুসারী।

অধিক বুঝতেন। ভবিষ্যতে যখন হজরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করবেন, তখন তিনি ইমাম আজম র. এর মাজহাবের উপর আমল করবেন। যেমন, খাজা মোহাম্মদ পারসা[১] কাদ্দাসা সিররুহু তাঁর কিতাব 'ফুসুলে সিত্তাতে' বর্ণনা করেছেন যে, 'তার মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, একজন উলুল আজম পয়গম্বর তাঁর মাজহাবের উপর আমল করবেন। অন্যান্য হাজারো বুজুর্গী এই একটি বুজুর্গীর মুকাবিলায় কিছুই নয়।'

আমাদের বুজুর্গ হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ কাদ্দাসা সিররুহু বলতেন, কিছুদিন আমিও নামাজের মধ্যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে থাকি। অবশেষে একদিন রাত্রিতে আমি ইমাম আজম র. কে স্বপ্নে দেখি। তিনি মর্যাদাপূর্ণ পোশাকে সুসজ্জিত অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে একটি কবিতা পাঠ করছিলেন, যার অর্থ ছিলো এরকম— আমার মাজহাবের মধ্যে অসংখ্য লোক আল্লাহ্‌র ওলী হয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকে আমি নামাজের মধ্যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া পরিত্যাগ করি।

মিন্‌হা-উনত্রিশ

ইজাযত হাসিল করা পূর্ণতার উপর নির্ভরশীল নয়, এ প্রসংগেঃ কখনো এমন হয় যে, কোনো কামেল বুজুর্গ কোনো নাকেস বা অপূর্ণ মুরীদকে তরীকতের তালিম দেয়ার জন্য ইজাযত প্রদান করেন এবং উক্ত নাকেস ব্যক্তির মুরীদদের আধিক্যের কারণে ঐ নাকেস ব্যক্তির কাজও পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ (কাদ্দাসা সিররুহু) মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. কে কামালাতের দরজায় পৌঁছানোর আগেই তরীকতের তালিম দেওয়ার জন্য ইজাযত প্রদান করেন এবং বলেন, 'হে ইয়াকুব! তুমি আমার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছো, তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।'

---

১. হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা র. এর আসল নাম–মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন মাহমুদ আল হাফেজী এবং তার লকব বা উপাধি ছিলো–পারসা। তিনি হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ র. এর খলীফা ছিলেন। তিনি হিজরী ৭৪৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন, হজ্জ সমাপনের পর তিনি মদীনাতে ৮২২ হিজরীর ২৪ শে জিলহজ্জ তারিখে ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে, হজরত আব্বাস রা. এর পার্শ্বে তাঁর রওজা মোবারক অবস্থিত।

অথচ অবস্থা এই ছিলো যে, মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. তরীকতের পূর্ণতা হাসিল করেন খাজা আলাউদ্দীন আত্তার কাদ্দাসা সিররুহুর নিকট থেকে। এইজন্য হজরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী, স্বীয় গ্রন্থ ‘নাফ্‌হাতুল উনসে’ ইয়াকুব চরখী র. কে সর্বপ্রথম খাজা আলাউদ্দীন আত্তারের মুরীদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং পরে তার নেসবত বা সম্পর্ক খাজা নকশবন্দ র. এর সাথে হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

বস্তুতঃ কোনো কামেল বুজুর্গ যখন স্বীয় কোনো মুরীদকে, বেলায়েতের বা ওলীত্বের কোনো দরজা হাসিলের পর, তরীকতের তালিম প্রদানের জন্য ইজাযত প্রদান করেন, তখন এ ইজাযতটিও ঐ প্রকারের হয়। এমতাবস্থায় সেই মুরীদ– একদিকে কামেল এবং অন্যদিকে নাকেস বা অপূর্ণ হয়। আর যে মুরীদ বেলায়েতের দুই বা তিনটি দরজা হাসিল করে, তার অবস্থাও তেমনি হয়। সে একদিকে পূর্ণ বা কামেল হয় এবং অপরদিকে নাকেস বা অপূর্ণ থাকে। কেননা, সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানোর আগে সমস্ত দরজা বা স্তরগুলিকে এক হিসাবে কামেল বলা যেতে পারে এবং অন্য হিসাবে নাকেসও বলা হয়। এতদসত্ত্বেও কোনো কামেল ওলী যখন স্বীয় কোনো মুরীদকে বেলায়েতের কোনো মাকাম হাসিলের পর, তাকে তরীকতের তালিম প্রদানের ইজাযত প্রদান করেন, তখন তা পূর্ণতার শেষ স্তর হাসিলের উপর নির্ভর করে না।

একটি সন্দেহের অপনোদনঃ স্মর্তব্য যে, অপূর্ণতা যদিও ইজাযত বা অনুমতি লাভের পথে অন্তরায়, তথাপিও যখন কোনো কামেল ব্যক্তি, যে অন্য ব্যক্তিকেও কামেল বানাতে সক্ষম– কোনো নাকেস বা অপূর্ণ ব্যক্তিকে নিজের নায়েব বা প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করেন এবং উক্ত ব্যক্তির হাতকে নিজের হাত হিসাবে বিবেচনা করেন। এমতাবস্থায় অপূর্ণতার ক্ষতি মারাত্মক হয় না। আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়া’লা সব বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

মিন্‌হা–ত্রিশ

ইয়াদ্ দাশতের তিনটি স্তর সম্পর্কেঃ ইয়াদ্ দাশতের অর্থ হলো— জাতে হক তায়া’লার সর্বক্ষণ হুজুরী বা নৈকট্য। কল্‌ব মাকামের অধিকারী ব্যক্তিদেরও কোনো কোনো সময় একাগ্রতার কারণে এই অবস্থা হাসিল হয়। কেননা, মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুই কলবের মধ্যে আছে। যদিও উভয়ের মধ্যে সংক্ষিপ্তি ও বিস্তৃতির পার্থক্য থাকে।

বস্তুতঃ মরতবায়ে কল্‌ব বা কলবের মাকামেও যাতে হক তায়া'লা ওয়া তাকাদ্দাসার হুজুরী সর্বক্ষণ লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এই অবস্থা, ইয়াদ্‌ দাশতের সুরত বা বাহ্যিক নিয়ম মাত্র, ইয়াদ দাশ্‌তের হাকীকত বা আসল রূপ নয়। এমন হতে পারে যে, মাশায়েখগণ 'ইনদিরাজুন্‌ নিহায়েত ফিল বিদায়েত' বা সর্বশেষ বস্তুর প্রারম্ভে প্রবিষ্ট হওয়া সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতে ইয়াদ দাশ্‌তের এই সুরতের দিকে ইংগিত করেছেন। ইয়াদ দাশ্‌তের হাকীকত তো তাযকিয়ায়ে নফস্‌ বা নফসের পবিত্রতা ও তায্‌কীয়ায়ে কল্‌ব বা কলবের বিশুদ্ধতার পরেই হাসিল হয়ে থাকে।

কিন্তু যদি যাতে হকের অর্থ 'মরতবায়ে ওজুব' গ্রহণ করা হয়, যার ফলে যাত পাক সমস্ত সিফাতে ওজুবীয়ার সমন্বয়কারী হন; এমতাবস্থায়, সমস্ত ইমকানী মারাতেব বা সম্ভাব্য স্তরসমূহ অতিক্রম করার পরেই, এই ধরনের শুহুদ বা দর্শন হাসিলের সাথে সাথেই, ইয়াদ দাশ্‌ত হাসিল হয়। আর তাজাল্লিয়াতে সিফাতীতেও এই অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কেননা, এই সময় সিফাত বা গুণাবলী সম্মুখে থাকা যাতে হক তায়া'লার হুজুরীর জন্য অন্তরায় হয় না।

কিন্তু যদি যাতে হক তায়া'লা অর্থ মুজাররাদ্‌ অহদীয়াত্‌ বা শুধুমাত্র একক সত্তা নেওয়া হয়, যা সর্বপ্রকার ইসম, সিফাত, নেসবত এবং ইতিবার থেকে মুক্ত; তবে এমতাবস্থায় ইয়াদ দাশতের হাসিল সর্বপ্রকার ইসম্‌, সিফাত, নেসবত ও ইতিবারের স্তর অতিক্রম করার পরেই সম্ভব হতে পারে।

এই ফকীর 'ইয়াদ দাশ্‌ত' সম্পর্কে যেখানেই বলেছে, সেখানে এই শেষের অর্থ গ্রহণ করেছে। এই স্থানে 'হুজুরী' শব্দের ব্যবহারও সঠিক নয়, যেমন ইয়াদ দাশতের মাকামধারীদের নিকট একথা স্পষ্ট কেননা, এ মাকাম 'হুজুর এবং গায়বত' বা উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থা হতে উচ্চ। হুজুর শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথেই এমন একটি গুণ সামনে থাকা জরুরী যা 'হুজুর' বা 'উপস্থিত' শব্দের জন্য উপযোগী। এ প্রকারের ইয়াদ দাশতের ব্যাখ্যা তাই, যা দ্বিতীয় অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ জাতে হকের অর্থ 'মরতবায়ে ওজুব' গ্রহণ করা। এইরূপ ধারণার ফলশ্রুতিতে, ইয়াদ দাশ্‌তকে সর্বশেষ স্তর বলা, শুহুদ ও হুজুরীর কারণে সম্ভব। কেননা, এই মরতবা বা স্তরের পরে শুহুদ ও হুজুরীর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না এবং সেখানে আছে হতবুদ্ধিতা, অজ্ঞতা অথবা মারেফাত বা পরিচিতি। কিন্তু এটা ঐ মারেফাত নয়, যাকে তুমি মারেফাত মনে করেছো। কেননা, তোমাদের ঐ মারেফাত তো আফয়ালী ও সিফাতী মারেফাত। আর এই মাকাম তো আস্‌মা ও সিফাতের মারেফাত হতে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সাইয়্যেদুল বাশার সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপরও দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

মিন্‌হা—একত্রিশ

দশটি মাকাম অতিক্রম করা ব্যতীত, সর্বশেষ স্তরে পৌঁছান সম্ভব নয়, এ সম্পর্কেঃ

এই রাস্তার পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং নিহায়াতুন্ নিহায়াহ বা মারেফাতের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছানো দশটি মাকাম অতিক্রম করার উপর নির্ভর করে। প্রথম মাকাম হলো— তওবাহ এবং সর্বশেষ মাকাম রিযা। পূর্ণতাপ্রাপ্তির মাকামসমূহের মধ্যে রিযার মাকামের ঊর্ধ্বে কোনো মাকাম নেই। এমনকি আখেরাতে আল্লাহ্‌র দর্শন এর চেয়ে বড় নয়। মাকামে রিযার হাকীকত আখেরাতে প্রকাশ পাবে। অন্যান্য মাকামের হাকীকত আখেরাত প্রকাশ পাবে না। সেখানে 'তওবার কোনো অর্থই নেই, নেই জুহুদের কোনো স্থান। সেখানে 'তাওয়াক্কুলের' কোনো প্রয়োজন নেই, নেই 'সবরের' কোনো ধারণা। অবশ্য যদিও 'শোকর' সেখানে পাওয়া যাবে, তবে তা হবে 'রিযার' একটি শাখা মাত্র। যা রিযা হতে আলাদা কোনো বস্তু নয়।

একটি প্রশ্নঃ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, একজন কামেল ব্যক্তি যে অন্যকেও কামেল বানাতে পারে, তাঁর মধ্যে দুনিয়ার প্রতি মহব্বত পাওয়া যায় কেনো? তার নিকট থেকে এধরনের এমন অনেক কথা প্রকাশ পায়, যা তাওয়াক্কুরের বিপরীত। বে-সবরী বা অধৈর্য্য— সবরের বিপরীত, তাও তার মধ্যে দেখা যায়। না পছন্দ— যা রিযা বা সন্তুষ্টির বিপরীত, তাও তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। এর কারণ কি?

জওয়াবঃ এর উত্তরে আমার বক্তব্য হলো— এই সমস্ত মাকাম হাসিল হওয়া কল্‌ব এবং রূহের সাথে সম্পৃক্ত। আর একান্ত খাস ব্যক্তিদের জন্য এ মাকাম 'নফসে মুতমাইন্না' বা প্রশান্ত নফসের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কালেব বা দেহের সাথে যা সম্পর্কিত, তা এই হাকীকত হতে বঞ্চিত। তবে এতটুকু হয় যে, শরীরের কাঠিন্য কোমলতায় পর্যবসিত হয়।

কোনো এক ব্যক্তি শিব্‌লী[১] র. কে জিজ্ঞাসা করেনঃ আপনি তো মহব্বতের দাবী করেন, কিন্তু আপনার মোটা তাজা শরীরটা তো এ দাবীর বিপরীত? তাঁর প্রশ্নের উত্তরে শিব্‌লী র. নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করেনঃ 'আমার কল্‌ব মহব্বত করেছে। কিন্তু আমার শরীর তার কোনো খবরই রাখে না। যদি শরীর এ ব্যাপার জানতো, সে কখনই মোটাতাজা হতো না।'

---

১. তাঁর কুনিয়াত আবু বকর। তিনি হজরত জুনায়েদ বোগদাদীর খলীফা ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় প্রেমে বিভোর অবস্থায় থাকতেন। শেষ জীবনে, না জানি কখন মৃত্যু আসে, এই ভয়ে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর পরিবর্তে কেবল 'আল্লাহ্ আল্লাহ' জিকির করতেন। তাঁর মর্যাদা এত অধিক ছিলো যে, তাঁর মোর্শেদ হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র. তাঁকে, 'কাওমের তাজ' খিতাবে বিভূষিত করেন। তিনি ২৭শে জিলহজ্জ, হিজরী ৩৩৪ সনে ৮৮ বৎসর বয়সে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

কাজেই, যদি কোনো কামেল ব্যক্তির কালেবে বা দেহে, এই সমস্ত মাকামের বিপরীত কোনো বস্তু প্রকাশ পায়, তবে সেই ব্যক্তির বাতিনী অবস্থার প্রেক্ষিতে তা তাঁর জন্য ক্ষতিকর হয় না। অপরপক্ষে, কোনো অপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে এই সমস্ত মাকামের অপূর্ণতার কারণে তার 'জাহির ও বাতিন' উভয় অবস্থাতেই অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। এই ধরনের লোকেরা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং তার সুরত ও হাকীকতে তাওয়াক্কুলের বিপরীত বস্তু পাওয়া যায়। তার কলব ও কালেব বা দেহ হতে অধৈর্য্য অস্থিরতা প্রকাশ পায় এবং তার রূহ এবং শরীর— এ উভয় বস্তু হতে কিরাহাত বা অপছন্দভাব প্রকাশ পায়। এই বস্তুগুলি, যা দিয়ে হক সুবহানুহু তায়া'লা স্বীয় ওলীদের আচ্ছাদিত করেছেন এবং অধিকাংশ লোকদেরকে তাদের কামালাত হতে মাহরুম রেখেছেন। এই সকল বস্তু ওলীদের মধ্যে অবশিষ্ট রাখার ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম হিকমত আছে এবং তা হলো— বাতিল হতে হকের পার্থক্য না হওয়া যা এই দুনিয়ার জন্য বিপদাপদ ও পরীক্ষার মাকাম বা স্থান, একান্ত জরুরী। আর ওলীদের মধ্যে এই বস্তুগুলি অবশিষ্ট থাকার দ্বিতীয় কারণ হলো— তাঁদের উন্নতি। যদিও এই বস্তুগুলি তাদের মধ্যে কেবল সুরত বা আকৃতি হিসাবে পাওয়া যায়। যদি এগুলি ওলীদের মধ্য হতে সম্পুর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, তবে তাঁদের উন্নতির রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তাঁরা ফিরিশতাদের ন্যায় একটি মাকামে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পায়রবী বা অনুসরণকে একান্ত প্রয়োজন মনে করেন। তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও সালম বর্ষিত হোক।

মিন্হা-বত্রিশ

আওলীয়া আল্লাহ্দের জাহির ও বাতিনের পার্থক্য সম্পর্কেঃ ইয়া ইলাহী। এ কেমন ব্যাপার, যা তুমি তোমার আওলীয়াদের সম্পর্কে নির্ধারণ করেছো? এদের বাতিন অবস্থা তো খিযির আ. এর আবে হায়াতের ন্যায় এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, যদি কেউ একবার তা পান করে, তবে সে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়। আর তাঁদের জাহির বা প্রকাশ্য অবস্থা প্রাণবিনাশকারী হলাহল সদৃশ। যে কেউ তাঁদের জাহির অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করবে, সে চিরস্থায়ী মৃত্যুর শিকার হবে।

তাঁরা ঐ ধরনের বুজুর্গ, যাদের বাতিন রহমতে পরিপূর্ণ এবং জাহির বেদনাময়। যারা তাদের বাতিন অবস্থা দর্শন করে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং যারা তাদের বাহ্যিক অবস্থা পরিদর্শন করে, তারা পথভ্রষ্ট হয়। বাহ্যতঃ তারা যবের ন্যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা গমের মতো। দৃশ্যতঃ তারা সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু হাকীকতে তারা খাস্ — ফিরিশতাদের ন্যায়। তারা বাহ্যতঃ যমীনের উপর বিচরণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আসমানে সায়ের বা ভ্রমণকারী। তাদের সোহবতে উপবেশনকারীগণ দুর্ভাগ্য হতে নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনকারীরা সৌভাগ্যবান হয়। আল্ কোরআনের ভাষায়ঃ 'এরাই আল্লাহ্‌র জামা'আত। মনে রেখো, আল্লাহ্‌র জামা'আতের লোকেরাই কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হবেন।'

আমাদের নেতা হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপরেও।

মিন্‌হা–তেত্রিশ

আওলীয়া আল্লাহ্‌দের গোপন থাকা সম্পর্কেঃ হক সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা স্বীয় ওলীদের এমনভাবে গোপন রেখেছেন যে, তাদের বাতিনী কামালাতের খবর, তাদের জাহিরী বা বাহ্যিক অবস্থাও জানে না। তাদের খবর অন্য লোকেরা কীভাবে জানবে? তাদের বাতিনের জন্য যে নেসবত হাসিল হয়েছে, সেটা বেঁ–চুনী বা তুলনাহীন এবং বেঁ–চুগুনী বা দৃষ্টান্তবিহীন। তাদের বাতিন যেহেতু 'আলমে আমর' বা 'আদেশ জগতের' সাথে সম্পৃক্ত, তাই তাদের সেই অংশ লাভ হয়েছে। আর জাহির বা প্রকাশ্য, যা পুরোপুরি চুঁ বা দৃষ্টান্তযুক্ত, তা তার হাকীকত কীরূপে জানবে? বরং এটাই বাস্তব যে, একান্ত অজ্ঞতা এবং সম্পর্কহীনতার জন্য সে এই নেসবত প্রাপ্তিকে অস্বীকার করবে। এরকমও হতে পারে যে, সে নেসবত হাসিল হওয়াকে স্বীকার করে, কিন্তু তা বুঝতে পারে না যে, এই নেসবতের সম্পর্ক কোন্ জাতের বা সত্তার সাথে। বরং অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, যার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক, সে তাকে অস্বীকার করে। এই সমস্ত ব্যাপার এই জন্য যে, এই নেসবত খুবই উঁচু মর্যাদার; এর মুকাবিলায় জাহির বা বাহ্যিক দিক খুবই নিচু মানের। আর বাতিনও এই নেসবতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং দর্শন ও অনুধাবন করার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পায়। সে জানতে পারে না যে, সে কি রাখছে এবং কিসের সাথে রাখছে। কাজেই তাঁর মারেফাত লাভ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতীত, আর

কোনো রাস্তাই নেই। এই কারণে, হজরত সিদ্দীকে আকবর রা. বলেছেন, 'জ্ঞাত হওয়া হতে অসমর্থ হওয়ার নামই – জ্ঞাত হওয়া। এখানে ইদরাক বা জ্ঞাত হওয়ার অর্থ হলো– বিশেষ নেসবত বা সম্পর্ক হাসিল হওয়া, যে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। কেননা, 'সাহবে ইদ্‌রাক' বা জ্ঞাত ব্যক্তি পরাভূত হয় এবং সে নিজেই জ্ঞাত বস্তুকে বুঝতে অক্ষম হয়। আর অন্য লোকেরাও তার হাল বা অবস্থা বুঝতে পারে না, যেরূপ উপরে বর্ণিত হয়েছে।

মিন্‌হা–চৌত্রিশ

বিদআতি ই'তিকাদ সম্পর্কেঃ একব্যক্তি সুফীদের পোশাক পরিহিত অবস্থায়, বিদআতি ই'তিকাদে লিপ্ত ছিলো। এ ফকীর তার ব্যাপারে সন্দীহান ছিলো। হঠাৎ আমি দেখি যে, সমস্ত আম্বীয়া আলায়হিমুস্ সালাত ওয়াস সালাম একত্রিত হয়েছেন এবং সকলে একমত হয়ে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন, 'এই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।' এমতাবস্থায় দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তির কথা আমার মনে উদয় হয়, যার সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিলো। আমি সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, আম্বীয়া আলায়হিমুস্ সালাম বলেন, 'সে আমাদের দলভুক্ত।' আমি আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়া'লার নিকট খারাপ ই'তিকাদ বা বিশ্বাস হতে এবং তাঁর সম্মানিত আম্বীয়াদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ হতে পানাহ চাই।

মিন্‌হা–পঁয়ত্রিশ

মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কেঃ এই ফকীরের উপর প্রকাশ পায় যে, কোরআন মজিদের মধ্যে হক সুবহানুহু ওয়া তায়া'লার 'কুরব' বা নৈকট্য, 'মায়ীআত' বা সংসর্গ এবং 'ইহাতা' বা আবেষ্টন শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন; এটা আলকোরআনের মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন— হাত, মুখ ইত্যাদিও।

একইরূপে আওয়াল, আখির, জাহির, বাতিন ইত্যাদি শব্দগুলিও মুতাশাবিহাতের অন্তর্গত। আমরা যদিও বলি, 'হক, সুবহানুহু তায়া'লা আমাদের নিকটবর্তী' কিন্তু আমরা জানি না 'কুরব' বা নৈকট্য কি? একইরূপে আমরা বলি, 'আওয়াল' বা আদি; কিন্তু আমরা অবহিত নই যে, আওয়ালের অর্থ কি? এই 'কুরব' এবং 'আওয়ালের' যে অর্থ আমরা জানতে বা বুঝতে পারি, হক সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা তা থেকে পবিত্র এবং সম্মানিত। আমাদের 'কাশ্‌ফ' বা আত্মিক দর্শন ও মুশাহিদায় বা তত্ত্বজ্ঞানে যা কিছু আসে, হক্ তায়া'লা তা থেকে বুলন্দ মর্তবার অধিকারী এবং পবিত্র। হক্ তায়া'লার নৈকট্য ও সংসর্গ সম্পর্কে কিছু তথাকথিত সুফীয়ানে কেরাম কাশ্‌ফ দ্বারা অবহিত হয়ে বলেছেন যে, 'আল্লাহ্ খুবই কাছে এবং আমাদের সাথেই আছেন', একথা সঠিক নয়। তারা 'ফিরকাহে মুজাস্‌সিমা' বা আকৃতিধারী গোত্রের অন্তর্ভূত হয়েছেন। কিছুসংখ্যক আলেম এ ব্যাপারে ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারা 'কুরব' বা নৈকট্যের দ্বারা 'কুরবে ইল্‌মী' বা 'জ্ঞানজাত নৈকট্য' অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা এইরূপ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে 'য়াদুন' বা হাতের ব্যাখ্যা করেছেন– 'কুদরত' বা শক্তির দ্বারা এবং 'অজ্‌হুন' বা চেহারার ব্যাখ্যা করেছেন–'যাত' বা সত্ত্বা দিয়ে। যারা তাবীলকারী বা ব্যাখ্যাকার তাদের দৃষ্টিতে এটা জায়েয বা বৈধ। আমরা তাবীল বা ব্যাখ্যা করাকে জায়েয মনে করি না; বরং তাদের তাবীলকে হক্ সুবহানুহু তায়া'লার ইলমে বা জ্ঞানে সমর্পণ করি। প্রকৃত ইলম আল্লাহ্‌রই নিকট, যিনি পবিত্র। হেদায়েতের অনুসারীদের প্রতি সালাম।

মিনৃহা–ছত্রিশ

ইত্তেবায়ে রসুল স. সম্পর্কেঃ এই ফকীর কখনো বেতের নামায রাতের প্রথম অংশে এবং কখনো শেষ অংশে আদায় করতো। এক রাতে আমার উপর প্রকাশ পায় যে, বেতেরের নামায শেষ রাতে আদায় করবার নিয়তে যে মুসল্লী নিদ্রা যায়, তার নেক আমল লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্‌তা, বেতের নামায আদায়কালীন সময় পর্যন্ত সমস্ত রাত তাঁর আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ করতে থাকে। সুতরাং বেতের

নামায বিলম্বে আদায় করাই উত্তম। এতদসত্ত্বেও এই ফকীরের নিকট, বেতেরের নামায আদায়ে দেরী বা তাড়াতাড়ি করার মধ্যে, সাইয়েদুল বাশার (তাঁর ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর দরূদ ও সালাম) এর পায়রবী করা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণীয় নয়। আমি কোনো ফযীলতকে নবীপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পায়রবীর সমতুল্য মনে করি না। হজরত রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বেতের নামাযকে কোনো সময় রাতের প্রথম অংশে এবং কোনো সময় শেষাংশে আদায় করতেন। এই ফকীর নিজের সৌভাগ্য তাতেই মনে করে যে, যে কোনো কাজের মধ্যে আঁ–হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ্য হাসিল হোক। যদিও এই সাদৃশ্য কেবল সূরত বা আকৃতিগত হোক না কেনো। কিছু লোক, কোনো কোনো সুন্নতের ব্যাপারে রাত্রি জাগরণের নিয়তে অন্যান্য কাজকে প্রাধান্য দেয়। তাদের অদূরদর্শিতার জন্য আমার বিস্ময় লাগে। আমি তো হাজার রাত্রি জাগরণকে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পায়রবী ব্যতীত, অর্ধ দানার যবের মূল্যেও খরিদ করি না।

আমি রমজান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করার জন্য বসি। এই সময় আমি সাথীদের বলি, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পায়রবী ব্যতীত, তারা যেনো অন্য কোনো নিয়ত না করে। কেননা, আমাদের এই একাগ্রতা ও দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক কর্তনে কি লাভ হতে পারে? বরং আমাদের যদি একটি সুন্নতের পায়রবী হাসিল হয়, তবে তার বিনিময়ে আমরা শতবার গ্রেফতারকে কবুল করতেও প্রস্তুত। বস্তুতঃ রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পায়রবীর অসিলা ব্যতীত, আমরা হাজার একাগ্রতা ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কর্তনে রাজী নই। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

ঘরেতে যার মজুদ আছে চিরন্তন কুসুম কানন,
বাগীচা ও বসন্তে তার কতোটুকু বলো প্রয়োজন।

আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা আমাদেরকে তাঁর স. পূর্ণ অনুসরণের তওফীক দান করুন। রসুল স. ও তাঁর পরিবার–পরিজনদের প্রতি পূর্ণ দরূদ ও সালাম।

মিন্‌হা–সাইত্রিশ

<u>**মহব্বতে যাতী ও মহব্বতে সিফাতীর পার্থক্য সম্পর্কেঃ**</u> একদা আমি দরবেশদের এক জামাতের সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহব্বতে বিভোর হয়ে বলি— 'আঁ–হজরত রসুলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহব্বত আমার উপর এমনভাবে গালেব বা জয়ী হয়েছে যে, আমি হক সুবহানুহু ওয়া তায়া'লাকে এই কারণে প্রিয় মনে করি যে, তিনি মোহাম্মদের রব।' উপস্থিত সকলে আমার এই বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিত হয়ে যান, কিন্তু কেউই কিছু বলতে সাহস পান না।

আমার এই বক্তব্য, হজরত রাবেয়া বসরী র. এর উক্তির সম্পূর্ণ খেলাফ। তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বপ্নে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করি যে, আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতে আমি এতোই বিভোর যে, আপনার মহব্বতের জন্য সেখানে কোনো স্থান খালি নেই। উপরোক্ত উভয় উক্তিই মত্ততাপ্রসূত। কিন্তু আমার কথার মধ্যে বাস্তবতা আছে। হজরত রাবেয়া বসরী র. এই উক্তিটি করেছিলেন পূর্ণ মত্ত অবস্থায় আর আমি বলেছি সজ্ঞান অবস্থায়। তাঁর উক্তিটি ছিলো সিফাতের মর্তবায় থাকাকালে এবং আমার উক্তিটি ছিলো যাতের মর্তবা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। কেননা, যাতের মর্তবার মধ্যে এই ধরনের মহব্বতের কোনো স্থান নেই। সকল নেসবতই এই মর্তবার নিচে অবস্থিত। কেননা, সেখানে আছে কেবল হতবুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতা। বরং এই মর্তবায় মানুষ আনন্দের সাথে মহব্বতকে অস্বীকার করে। কোনোভাবেই নিজেকে আল্লাহ্‌র মহব্বতের যোগ্য বলে নিজেকে মনে করে না। মহব্বত এবং মারেফাত, কেবল মর্তবায়ে সিফাতের মধ্যেই হয়ে থাকে, মর্তবায়ে যাতের মধ্যে হয় না।

বস্তুতঃ লোকেরা যাকে 'মহব্বতে যাতী' বলেছে, তার অর্থ 'যাতে আহদীয়াত' বা একক যাত নয়; বরং ওটা ঐ যাত, যার সাথে বিভিন্ন 'সিফাত' বা গুণ মিশ্রিত। কাজেই হজরত রাবেয়া বসরী র. এর ঐ মহব্বত ছিলো গুণমিশ্রিত সত্তার সাথে। আল্লাহ্‌ সুব্‌হানুহু ওয়া তায়া'লাই সত্য কথাকে অন্তরে নিক্ষেপকারী। সাইয়্যেদুল বাশার সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজনদের উপর দরূদ ও সালাম।

মিন্‌হা-আটত্রিশ

<u>**ইল্‌মে জাহির, ইল্‌মে বাতিন-পীর ও উস্তাদের সম্মান সম্পর্কেঃ**</u> ইলমের ফযীলত, জ্ঞাত বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা অনুসারে হয়ে থাকে। জ্ঞাত বিষয়টি যতোই মর্যাদাসম্পন্ন হবে, তার 'ইলম' বা জ্ঞানও ততো উঁচু স্তরের হবে। সুতরাং ইলমে বাতিন, যার সাথে সুফীয়ায়ে কিরামদের বিশেষ সম্পর্ক, তা ইলমে জাহির হতে উত্তম যা জাহিরী আলেমদের অংশ। ইলমে জাহির (কোরআন হাদীছের প্রকাশ্য বিদ্যা) ক্ষৌর বিদ্যা ও তন্তু বিদ্যা হতে শ্রেষ্ঠ।

কাজেই, পীরের মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখা, যার নিকট হতে বাতিনী ইলম শিক্ষা করা হয়, ঐ উস্তাদের মর্যাদা হতে কয়েকগুণ অধিক, যার নিকট হতে জাহিরী ইলম শিক্ষা করা হয়। একইরূপে জাহিরী ইলমের উস্তাদের মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা, ঐ উস্তাদের মর্যাদার চাইতে অনেক অধিক— যার নিকট হতে ক্ষৌরবিদ্যা ও তন্তুবিদ্যা শিক্ষা করা হয়। এমন পার্থক্য জাহিরী ইলমের প্রতিটি শাখায় বিদ্যমান।

বস্তুতঃ ইলমে কালাম এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের উস্তাদ, ইলমে নুহ ও সরফের (ব্যাকরণ ও বাক্যলংকার শাস্ত্রের) উস্তাদের চাইতে অধিক সম্মানিত। নুহ ও সরফের উস্তাদ, দর্শনের উস্তাদের চাইতে অধিক শ্রেয়। এটা এই জন্য যে, দর্শনশাস্ত্র বিশ্বস্ত ইলমসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। এই জ্ঞানের অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় বেহুদা ও অপ্রয়োজনীয় এবং এতে অনেক কম বিষয় আছে, যা ইসলামী গ্রন্থসমূহ হতে নেওয়া হয়েছে। তারা এতে এমন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে যে, যার ফলে তারা পণ্ডিত মূর্খ (?) ব্যতীত আর কিছুই হয়নি। কেননা, এখানে জ্ঞানের কোনো স্থান নেই। নবুয়তের ধারায় প্রাপ্ত জ্ঞান, 'আকলে নজরী' বা দর্শনীয় জ্ঞান হতে সম্পূর্ণ আলাদা।

এখানে উল্লেখ্য যে, পীরের হক অন্য সকলের হকের চাইতে অধিক। বরং বলা যায় যে, পীরের হকের সাথে অন্য কারো হকের তুলনাই হতে পারে না। হক সুবহানুহুর অনুগ্রহরাজী এবং তাঁর রসুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইহ্‌সানের পরেই পীরের হকের দর্জা। বরং সকলেরই হাকীকি পীর তো স্বয়ং রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। যদিও জাহিরী জন্ম মাতাপিতার মাধ্যমে

হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃত জন্ম পীরের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাহ্যিক জন্মের হায়াত তো মাত্র কিছুদিনের জন্য। কিন্তু প্রকৃত জন্মের হায়াত চিরস্থায়ী। পীর তো তিনিই, যিনি মুরীদের বাতিনী অপবিত্রতা পরিষ্কারকারী এবং কলব ও রূহের দ্বারা মুরীদের অভ্যন্তরের অপবিত্র জিনিসসমূহ পরিষ্কার করে তিনি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন। কোনো মুরীদকে তাওয়াজজুহ্ দেওয়ার সময় অনুভূত হয় যে, তার বাতিনী অপবিত্রতাসমূহ তাওয়াজ্জুহ্ প্রদানকারী ব্যক্তির উপরও মলিনতার প্রভাব বিস্তার করে, যা তন্মধ্যে বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। পীরই একমাত্র ব্যক্তি, যার অসীলায় মানুষ মহিমান্বিত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে; যা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। পীরের অসীলাতেই 'নফসে আম্মারা'— যা সৃষ্টিগতভাবে 'খাবাস' বা কলুষিত, তা পবিত্রতা হাসিল করে এবং পরিশুদ্ধ হয় এবং 'আম্মারা' বা কলুষতা হতে ইতমিনান বা প্রশান্তির মাকামে উন্নীত হয় এবং সৃষ্টিতে কুফরী হতে হাকীকি বা প্রকৃত ইসলামে সমুন্নত হয়। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

করি যদি আমি মূল ব্যাখ্যা ইহার,
জানিবে নিশ্চয় এযে, হবে বেশুমার।

বস্তুতঃ যদি কোনো পীর কোনো মুরীদকে গ্রহণ করেন, তবে মুরীদের উচিত তাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করা। অপরপক্ষে, কোনো পীর যদি কোনো মুরীদকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে মুরীদের উচিত তাকে নিজের 'বদবখতী' বা দুর্ভাগ্য হিসাবে গণ্য করা। আমি এরকম অবস্থা থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। হক সুবহানুহু তায়া'লার 'রিযা' বা সন্তুষ্টিকে, পীরের 'রিযা'বা সন্তুষ্টির পশ্চাতে রাখা হয়েছে। যতক্ষণ না মুরীদ নিজকে স্বীয় পীরের সন্তুষ্টির মধ্যে বিলীন করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে হক্ সুবহানুহুর 'রিযামন্দী' বা সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হবে না। মুরীদের সব চাইতে বড় বিপদ হলো— পীরের অসন্তুষ্টি। সব রকমের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ সম্ভব, কিন্তু পীরের অসন্তুষ্টির কারণে যে ক্ষতি হয়, তা পূরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, পীরের অসন্তুষ্টি মুরীদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ। এ অবস্থা থেকে হক সুবহানুহু তায়া'লার নিকট পানাহ চাই। এর ফলশ্রুতিতেই মুরীদের দীনি আকীদায় ত্রুটি বিচ্যুতি এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম প্রতিপালনের মধ্যে অলসতা এসে পড়ে। বাতিনী হাল এবং উচ্চ মাকামসমূহ উত্তীর্ণের প্রশ্নই আসে না। পীরের অন্তরে কষ্ট দেওয়ার পরেও যদি মুরীদের মধ্যে কোনোপ্রকার হালের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে, তবে তাকে ইসতিদরাজ বা ছলনা মনে করবে। কেননা শেষ পর্যন্ত তার প্রতিফল খারাপই হবে এবং তার পরিণতি ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। হেদায়েতের অনুসারীদের উপর সালাম।

মিন্‌হা-উনচল্লিশ

<u>**ছয় লতীফা সম্পর্কেঃ**</u> কলবের সম্পর্ক 'আলমে আমর' বা আদেশ জগতের সাথে। কল্‌বকে 'আলমে খাল্‌ক' বা সৃষ্টি জগতের সাথে মিলিত এবং প্রেমাশক্ত করে, আলমে আমর থেকে আলমে খালকের দিকে, নিচে অবতরণ করানো হয়েছে এবং বুকের বাম পাশের মাংস পিণ্ডের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এইরূপ যে, কোনো বাদশাহ্ যেনো কোনো মেথরের প্রেমাশক্ত এবং এই ইশকের কারণে বাদশাহ্ মেথরাণীর গৃহে উপনীত।

আর রূহ— যা কল্‌ব অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, 'আসহাবে য়ামীন' বা বুকের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। আরো তিনটি লতীফা, যা 'লতীফায়ে রূহের' উপর অবস্থিত; তা কর্মে মধ্যম পন্থাই উত্তম, এই প্রবাদ বাক্যের আলোকে উৎকৃষ্টের মর্যাদায় সমাসীন। লতীফা যতোই সূক্ষ্ম হবে, ততোই তা মধ্যম পন্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। কিন্তু ব্যাপার এই যে, 'লতীফায়ে' সের' এবং 'লতীফায়ে খফী' উভয়ই 'লতীফায়ে আখফার' দুইদিকে অবস্থিত। এর একটি বামদিকে এবং অপরটি ডানদিকে অবস্থিত। আর 'লতীফায়ে নফস,' যা এর কাছেই অবস্থিত, তা মস্তিস্কের সাথে সম্পর্কিত, লতীফায়ে কলবের উন্নতি এই অবস্থার উপর নির্ভরশীল যে, তা রূহের মাকামে এবং তার উপরের মাকামেও উন্নীত হবে। একইভাবে, রূহ এবং এর উপরের মাকামগুলির উন্নতি এদের উপরের মাকামে পৌঁছানোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই পৌঁছানো, প্রথম দিকে 'হালের' বা অবস্থার আকারে হয়ে থাকে এবং শেষের দিকে 'মাকামের' বা স্থানের হিসাবে। আর নফসের উন্নতি তখনই হয়, যখন তা শুরুতে হাল হিসাবে এবং শেষে মাকাম হিসাবে কলবের মাকামে পৌঁছায়। অবশেষে, এই ছয়টি লতীফা আখফার মাকামে পৌঁছায় এবং সবগুলি একত্রিত হয়ে আলমে কুদ্দুস বা পবিত্র জগতের দিকে উড্ডয়নের ইরাদা করে এবং লতীফায়ে কালেব বা দেহকে খালি রেখে যায়। কিন্তু এই উড্ডয়ন প্রথম দিকে হাল হিসাবে হয় এবং পরে মাকাম হিসাবে এবং এই সময় 'মাকামে ফানা' বা লয়ের মাকাম হাসিল হয়।

<u>মৃত্যুর আগে মৃত্যু কি? সে সম্পর্কেঃ</u> সূফীয়ায়ে কিরাম যাকে 'মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করা' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তা হলো, লতীফায়ে কালেব বা দেহ থেকে উক্ত ছয় লতীফার বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই লতীফাসমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও দেহের মধ্যে অনুভূতি ও স্পন্দন অবশিষ্ট থাকার গোপন ভেদ অন্যস্থানে বর্ণিত হয়েছে। যা যথাস্থানে অনুসন্ধান করা দরকার। এখানে এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের অবকাশ নেই। বরং এই স্থানে আকারে ইংগিতে বর্ণনা করা হলো।

আত্মিক ভ্রমণের জন্য এটা জরুরী নয় যে, সমস্ত লতীফা এক মাকামে একত্রিত হয়ে সেখান থেকে ঊর্ধ্বে বিচরণ শুরু করবে। কখনো এমন হয় যে, কলব এবং রূহ উভয়ে মিলিত হয়ে এইরূপ করে, কখনো তিন এবং কখনো চার লতীফা মিলিত হয়েও ঊর্ধ্বে ভ্রমণ করে। কিন্তু যে কথা প্রথমে আলোচিত হয়েছে, (অর্থাৎ ছয় লতীফা সম্মিলিত হয়ে একসংগে ভ্রমণ) এটাই উচ্চ মর্তবা এবং পূর্ণতার অবস্থা। আর এই অবস্থা বেলায়েতে মোহাম্মাদী আলায়হি ওয়া আলিহি ওয়াস্ সালাত্ ওয়াত্ তাসলীমাতের সঙ্গে খাস। এতদ্ব্যাতীত অন্যান্য অবস্থাগুলিও 'বেলায়েতের' বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে একটি। যদি উক্ত ছয় লতীফা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, 'মাকামে কুদ্দুস' বা পবিত্র স্থানে পৌঁছে এবং তার রঙে রঞ্জিত হয়ে আবার দেহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে এবং তারা মহব্বতের সম্পর্ক ব্যতীত অন্য সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তারা 'কালেব' বা দেহের অনুশাসন মেনে নেয় এবং এই মিলনের পরে এক ধরনের ফানা সৃষ্টি করে এবং মৃতের ন্যায় হয়ে যায়। এ সময় তা একটি খাস তাজাল্লীতে নূরান্বিত হয় এবং নতুনভাবে জীবন ধারণ শুরু করে। আর বাকাবিল্লাহের মাকামে সুদৃঢ় হয়ে, আল্লাহ্র আখলাক বা চরিত্রে চরিত্রবান হয়। এ সময় যদি তাদেরকে ঐ রাজকীয় পোশাক প্রদান করে দুনিয়ার দিকে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন ব্যাপারটি নিকট হতে দূরে যাওয়ার পর্যায়ভুক্ত হবে এবং 'তাকমীল' বা পূর্ণতার ভূমিকা তৈরী করবে। আর যদি তারা দুনিয়ার দিকে ফিরে না আসে এবং নিকটবর্তী হওয়ার পর দূরবর্তী না হয়, তবে তারা 'আওলীয়ায়ে–উযলাত' বা নির্জন ওলীদের মধ্যে পরিগণিত হবে। তারা তালেব বা মুরিদদের প্রতিপালন এবং অপূর্ণ লোকদের পূর্ণতা প্রদান করতে সক্ষম হবে না। এ সমস্ত আদি ও অন্তের কথা যা ইশারা ও ইংগিতে বর্ণনা করা হলো। এ রাস্তা অতিক্রম করা ব্যতীত এ অবস্থা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং যারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পায়রবীকে আবশ্যক মনে করেন।

মিন্হা–চল্লিশ

<u>**কালামে ইলাহী সম্পর্কেঃ**</u> হক সুব্হানুহু ওয়া তায়া'লা আদি হতে অন্ত পর্যন্ত একই কালামের সাহায্যে কথোপকথনকারী। এই কথার অর্থ হচ্ছে, এর কোনো ভাগ এবং বিভক্তি সম্ভব নয়। কেননা, চুপ থাকা এবং মুক হওয়া আল্লাহ্তায়ালার জন্য অসমীচীন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেখানে আদি হতে অন্ত পর্যন্ত– একটি মুহূর্ত মাত্র। কেননা, আল্লাহ্ সুবহানুহুর 'যাতের' বা সত্তার উপর কালের কোনো প্রবাহ নেই। এটা সুস্পষ্ট যে, একটি মুহূর্তের মধ্যে, একটি একক বা অবিমিশ্র কালাম ছাড়া আর কি হতে পারে? এই একটি 'কালাম' বা কথার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারটি বিভিন্ন হওয়ার কারণে কালামেরও বিভিন্ন ধরন সৃষ্টি হয়। যেমন— যদি তার সম্পর্ক 'আমর' বা নির্দেশের সাথে হয়, তবে তার দ্বারা 'আমর' বা নির্দেশের সৃষ্টি হয়। আর যদি তার সম্পর্ক 'মান্হী' (যা নিষেধ করা হয়) এর সাথে হয়, তখন তার নাম হয় 'নেহী' বা নিষেধ। যদি তার সম্পর্ক বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সংগে হয়, তখন তা খবর হয়। এ সম্পর্কে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত খবরটি অনেককে সন্দেহে ফেলে দেয়। বর্ণনাকৃত বিষয়ের অগ্র এবং পশ্চাৎ উদ্দেশ্যের অগ্র ও পশ্চাতের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এটা কোনো জটিল ব্যাপার নয়। কেননা, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল, বর্ণনাকৃত বিষয়ের জন্য বিশেষ গুণ, যা ঐ মুহূর্তের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যেহেতু উক্ত মুহূর্তটি স্বীয় অবস্থানে আছে এবং কোনোরূপ বিস্তৃতি সেখানে সৃষ্টি হয়নি। কাজেই, সেখানে অতীত এবং ভবিষ্যতের কোনো অবকাশ নেই। দার্শনিকদের অভিমত হলোঃ একটি পদার্থের উপাদান বাহ্যিক অস্তিত্বের দিক দিয়ে এক ধরনের এবং কাল্পনিক অস্তিত্বের দিক দিয়ে তার গুণাবলী অন্য ধরনের হয়। যখন একই বস্তুতে, উপাদান ও গুণাবলী বিভিন্ন হওয়ার কারণে সেটা ভিন্ন হতে পারে, তখন বর্ণনাকারী ও বর্ণিত বস্তু, যা প্রকৃতপক্ষে একটি অন্যটি থেকে আলাদা, সেটাও অনিবার্যভাবে ভিন্ন হতে পারে।

উপরে যা বর্ণিত হয়েছে তা আদি হতে অন্ত পর্যন্ত একটি মুহূর্ত মাত্র, এটা বাকপদ্ধতির সংকীর্ণতা হেতু। প্রকৃতপক্ষে, সেখানে একথা বলার কোনো অবকাশ নেই। এখানে তো কালের মতো, মুহূর্তও বলা যায় না।

দায়েরায়ে ইমকানের বাইরে আদি ও অন্ত মিশ্রিতঃ প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যধারীগণের মধ্যে যিনি 'দায়েরায়ে ইমকান' বা সম্ভাব্য বৃত্ত অতিক্রম করে তদূর্ধ্বে গমন করেন, তিনি আদি ও অন্তকে মিলিতরূপে পান। হজরতে রিসালাতে খাতেমীয়াত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শবেমিরাজে তাঁর ঊর্ধ্বগমনের সময় হজরত ইউনুস আলায়হিস্ সালামকে মাছের পেটের মধ্যে দেখেছিলেন, নুহ আলায়হিস্ সালামের সময়ের তুফানও মওজুদ ছিলো। তিনি বেহেশতীদের বেহেশতে দেখেছিলেন এবং দোজখীদের দোজখে। বেহেশতে দাখিল হওয়ার সময়ের পাঁচশত বৎসরকে তিনি অর্ধদিবস হিসাবে পেয়েছিলেন। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. যিনি ধনী সাহাবী ছিলেন, তাঁকে বিলম্বে বেহেশতে আসতে দেখে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলয়াহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায়, উত্তরে তিনি বিপদসংকুল রাস্তার বর্ণনা দেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী এক মুহূর্তেই সংঘটিত হয়েছিলো, সেখানে অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো স্থানই ছিলো না। আল্লাহ্‌তায়ালা এই ফকীরকেও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তোফায়েলে কখনো কখনো এইরূপ দর্শন দান করেছেন। আমি ফিরিশতাদেরকে দেখলাম যে, তাঁরা হজরত আদম আলায়হিস সালামকে সিজদাহ করছে এবং তাঁরা এখনও সিজদাহ হতে মাথা উঠাননি। ইল্লিনের ফিরিশতা, যাদের প্রতি সিজদার হুকুম হয়নি— ঐ সমস্ত ফিরিশতাদেরকে সিজদাহকারী ফিরিশতা হতে আলাদা দেখলাম। তাঁরা তাঁদের মুশাহিদায় মত্ত এবং বিভোর। আর ঐ সমস্ত অবস্থা, যে সম্পর্কে আখেরাতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কিছু এক মুহূর্তেই অবলোকন করি। এই দর্শনের পর অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, সেই জন্য আমি আখেরাতের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করছি না। কেননা, আমার স্মরণ শক্তির উপর পূর্ণ আস্থা নেই।

মিরাজে নবুবী ও উরুযে আওলীয়ার মধ্যে পার্থক্যঃ এতটুকু জানা প্রয়োজন যে, এই অবস্থা (মিরাজ) রসুলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দৈহিক ও রূহানী উভয়েরই হাসিল হয়েছিলো এবং তাঁর যা কিছু দর্শন হয়েছিলো তা তিনি চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে অবলোকন করেছিলেন। কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে যারা তোফায়েল বা তাঁর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত, তাঁরা তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র রূহানীভাবে মুশাহিদা বা অবলোকন করে থাকেন। তাঁরা একই সঙ্গে শরীর এবং বাইরের চোখ দিয়ে দেখেন না। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

জানি−যেথায় আছে বন্ধু আমার
সেথায় যাওয়ার শক্তি নাই,
তাই-দূর থেকে তার ঢোলের আওয়াজ
হেথায় বসে শুনতে চাই।

তাঁর স. ও তাঁর পরিবার পরিজন সকলের উপর পরিপূর্ণ সালাত ও সালাম।

মিন্‌হা—একচল্লিশ

তক্‌বীন সম্পর্কেঃ তক্‌বীন বা সৃষ্টিকরণ আল্লাহ্‌তায়ালার একটি হাকীকি সিফাত বা মূল গুণ। হজরত আবুল হাসান আল্‌ আশ'আরীর অনুসারীগণ তক্‌বীনকে একটি 'সিফাতে—ইযাফীয়া' বা অতিরিক্ত গুণ হিসাবে মনে করেন এবং তারা 'কুদরত' বা শক্তি ও 'ইরাদা' বা ইচ্ছাকে, বিশ্বসৃষ্টির জন্য যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু সঠিক ব্যাপার হলো— কুদরত ও ইরাদা ছাড়াও তক্‌বীন একটি পৃথক হাকীকি সিফাত বা মূল গুণ। এর ব্যাখ্যা এই যে, কুদরতের অর্থ হলো— ওতে কোনো কাজ করা এবং না করা উভয়ই সঠিক। আর ইরাদার অর্থ হলো কুদরতের উক্ত দুইটি দিকের অর্থাৎ করা এবং না করার একটি দিককে নির্ধারিত করা। সুতরাং কুদরতের দরজা, ইরাদার দরজার উপরে। বস্তুতঃ তক্‌বীন যাকে আমরা হাকীকি সিফাত হিসাবে মনে করি, তার দরজা 'কুদরত' ও ইরাদার দরজাসমূহের পরে অবস্থিত। এই সিফাত বা গুণের কাজ হলো— নির্ধারিত দিককে 'অজুদ' বা অস্তিত্বে আনা। সুতরাং কুদরত কাজকে সঠিকভাবে চিহ্নিতকারী সিফাত বা গুণ এবং ইরাদা কাজকে খাস্‌ বা নির্দ্দিষ্টকারী সিফাত; আর 'তক্‌বীন' কাজকে অস্তিত্বে আনয়নকারী সিফাত। কাজেই, তকবীনের সিফাতকে স্বীকার করা ছাড়া, আর কোনো গত্যন্তর নেই। এর অবস্থা কর্ম সম্পাদনে সামর্থ্যের ন্যায়, যাকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমগণ বান্দাদের জন্য স্থির করেছেন। আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সামর্থ্য 'কুদরত' স্থির হওয়ার পরে হতে পারে। বরং ইরাদার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পরেই হয়। আর অস্তিত্ববান হওয়ার দৃঢ়তা, এই সামর্থ্যের সাথে সম্বন্ধিত। বরং এই সামর্থ্যই কাজের দিককে জরুরী মনে করে এবং এর বিপরীত কাজ না করার দিকটি সেখানে অনুপস্থিত। তক্‌বীন সিফাতের অবস্থাও এইরূপ। অস্তিত্ববান হওয়ার দৃঢ়তা তার সঙ্গে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই 'ইজাব' (প্রয়োজন মনে করা) আল্লাহ্‌তায়ালার যাতের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করে না; কেননা, তার

স্থিতি, 'সিফাতে কুদরত' ও 'সিফাতে ইরাদার' স্থির হওয়ার পরে হয়। বস্তুতঃ 'কুদরতের' প্রকৃত অর্থ— কোনো কাজ করা এবং না করাকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং 'ইরাদা' তার একটি দিক অর্থাৎ করা বা না করাকে নির্দিষ্ট করে। এই বক্তব্যটি বিজ্ঞ দার্শনিকদের অভিমতের বরখেলাফ বা বিপরীত। প্রথম শর্তটিকে (অর্থাৎ যদি ইচ্ছা করেন, তবে সৃষ্টি করতে পারেন) সত্যের উপযোগী মনে করেন এবং দ্বিতীয় শর্তটিকে (অর্থাৎ যদি না চান, তবে সৃষ্টি করেন না) সত্যের অপালাপ হিসাবে মনে করেন এবং 'সিফাতে ইরাদা'কে অস্বীকার করেন। এই বক্তব্য হিসাবে 'ইজাবে সরীহ' বা স্পষ্ট প্রয়োজন বাধ্যতামূলক হয়। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়া'লার যাত বা সত্তা এ অবস্থা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

ঐ 'ইজাব' বা প্রয়োজন, যা ইরাদা বা ইচ্ছার সাথে যুক্ত এবং কুদরতের দু'টি দিকের একটিকে স্থির করণের পর সৃষ্টি হয়, তা ইখতিয়ারকে বাধ্যতামূলক করে; তাকে অস্বীকার করে না। 'ফতুহাত' গ্রন্থের লেখক (শায়েখ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী) এর কাশ্‌ফও দার্শনিকদের মতের অনুরূপ। তিনি 'কুদরতের' ব্যাপারে প্রথম শর্তটিকে সত্যের উপযোগী মনে করেন এবং দ্বিতীয় শর্তটিকে সত্যের অপলাপ হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু এরকম হলে তো ইজাব বা বাধ্যকরণকে মেনে নেয়া হয়। যার ফলে ইরাদার কোনো ভূমিকাই থাকে না। কেননা, দুইটি একই ধরনের বিষয় থেকে একটিকে নির্দ্দিষ্ট করা অবস্থা এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু, যদি তকবীনের সিফাতের মধ্যে ইজাবকে নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তবে এর সুরাহা হতে পারে। কেননা, তা এই প্রয়োজনের তাগিদের উর্ধ্বে। এই পার্থক্যটি খুবই সূক্ষ্ম, যা আমার আগে আর কেউই বর্ণনা করেননি। যদিও মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়ের আলেমগণ এই সিফাত বা তকবীনকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁরা এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটির আলোচনা করেননি। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণই তাঁদেরকে, সমস্ত মুতাকাল্লেমীনদের মধ্যে, এই মারেফাত বা গুপ্ত তত্ত্বের দ্বারা বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছে। এই অধমও উক্ত বুজুর্গদের উত্তরসূরী। আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে, সাইয়্যেদুল মুরসালীনের তোফায়েলে, তাঁর সঠিক ও সত্য আকায়েদের উপর সুদৃঢ় রাখুন।

মিন্‌হা–বিয়াল্লিশ

<u>রুইয়াতে বারী তায়া'লা সম্পর্কেঃ</u> আখেরাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ 'আয্‌যা ও জাল্লাহুর দর্শন সত্য। এটি ঐ মাসআলা, যাকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ব্যতীত, ইসলামী অন্যান্য ফির্‌কা এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণ কেউই জায়েয বলেননি। তাদের অস্বীকার করার কারণ হলোঃ গায়েব বা অদৃশ্যকে, হাজির বা দৃশ্যের উপর কিয়াস বা ধারণা করা, যা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। দৃষ্ট বস্তু যখন তুলনাহীন ও সাদৃশ্যবিহীন হয়, তখন সে সম্পর্কিত দর্শনও তুলনাবিহীনই হবে। এ বিষয়ের উপর ইমান আনা প্রয়োজন, কিন্তু তার কাইফিয়াত বা স্বরূপ কী, সে ব্যাপারে মশগুল বা লিপ্ত না হওয়াই উচিত। বর্তমানে এই সত্যটি বিশিষ্ট আওলীয়াদের উপর প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা যা কিছু দর্শন করেন, যদিও তা রুইয়াতে হক বা বাস্তব দর্শন নয়, তবুও তা– অদর্শনও নয়। বরং অবস্থা এই যে, যেমন হাদীছ পাকের ইরশাদ 'যেনো তুমি যাতে হক তায়া'লাকে দেখছো।' কেয়ামতের দিন সমস্ত মুমিন হক সুবহানুহু ওয়া তায়া'লাকে স্বীয় বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা অবলোকন করবে। কিন্তু অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। যেমন, কোরআন পাকের ইরশাদ 'দৃষ্টিসমূহ তাঁকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।' বস্তুতঃ, তারা কেবল দুটি বিষয় হৃদয়ংগম করতে পারবে; প্রথমতঃ দর্শনকারী 'ইলমুল ইয়াকীন' বা বিশ্বাস জ্ঞান লাভ করবে এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত দর্শন দ্বারা আনন্দ ও সন্তুষ্টি এবং তার স্বাদ গ্রহণ করবে। এই দুইটি বস্তু ব্যতীত, দর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যাপারই তিরোহিত হবে। এই বিষয়টি ইলমে কালামের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জটিল। জ্ঞান এ বিষয়ের প্রমাণে এবং এর চিত্রাবলী অংকনে অক্ষম। যে সমস্ত আলেম ও সূফী শুধুমাত্র নবীগণের অনুসারী, তারা নবুয়তের নূর হতে সংগৃহীত নূরে ফিরাসাত বা অর্ন্তদৃষ্টির নূর দ্বারা তাঁকে দর্শন করেছেন। একইভাবে, ইলমে কালামের বা কথাশাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়গুলিও। জ্ঞান যা প্রমাণে অক্ষম ও হতবাক হয়, সেখানে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলেমগণ ফিরাসাতের নূর দ্বারা তা অবলোকন করেন। কিন্তু সুফীদের ব্যাপার হলো নূরে ফিরাসাতের সঙ্গে তাদের কাশ্‌ফ এবং শুহুদও হাসিল হয়ে থাকে।

কাশ্ফ এবং ফিরাসাতের মধ্যে পার্থক্যঃ কাশ্ফ এবং ফিরাসাতের মধ্যে তদ্রূপ পার্থক্য, যদ্রূপ পার্থক্য অনুমান এবং অনুভবের মধ্যে। ফিরাসাত বা অন্তর্দৃষ্টি, নজরিয়াত (যার জন্য দলিল প্রমাণের আবশ্যক হয়, এমন বস্তু)–কে, অনুমানের বস্তুতে পরিণত করে এবং কাশফ তাকে, অনুভবের বস্তুতে পরিণত করে। ঐ সমস্ত মাসআলা, যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ বলেছেন কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীগণ যারা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন— তারা তাকে অস্বীকার করেছেন। এ সমস্ত একই ধরনের। তারা সেটা ফিরাসাতের নূর দ্বারা জেনেছেন এবং সঠিক কাশ্ফের মাধ্যমে দর্শন করেছেন। যদি এ ব্যাপারগুলি কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায়, তবে চিত্রাঙ্কন এবং উপদেশ দেওয়াই সার হবে। বাস্তব দলিল প্রমাণাদি দ্বারা এ ব্যাপারটি সঠিক প্রতিপন্ন করা খুবই কঠিন। কেননা, জ্ঞানের চিন্ত া এবং দৃষ্টি— তার প্রতিষ্ঠায় এবং চিত্রাঙ্কনে অন্ধ মাত্র। এ সমস্ত ব্যাপারে যারা মনে কর যে, তারা দলিল প্রমাণাদির সাহায্যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করবে এবং বিরোধী পক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, তা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা, তাদের বিরোধীপক্ষ এসব দেখে মনে করবে যে, তাদের দলিলগুলি যেমন দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি তাদের বিষয়গুলিও ভ্রান্তিপূর্ণ এবং দুর্বল ও অসম্পূর্ণ।

যেমন, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ 'ইস্তাতাআঁত্ মা'আল্ ফে'ল্' বা 'কর্ম সম্পাদনে শক্তি থাকা' কে স্থির করেছেন। এটি এমন একটি হক্ ও সহীহ্ মাসআলা– যা 'নূরে ফিরাসাত' ও 'কাশফে সহীহ' দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু একথা প্রমাণের জন্য তারা যে দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেন, তা একেবারেই দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ। এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য তারা যে সমস্ত দলিল পেশ করেন, তার মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী দলিল হলো দুইটি যামানা বা কালের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকা। কেননা, জাওহার (যা কোনো সাহায্য ব্যতিরেকে নিজে নিজেই অস্তিত্ববান) এর বিপরীতে 'আরজ (যা অন্য বস্তুর কারণে স্থিতিশীল); উভয়ই কালের মধ্যে একই সাথে স্থিত হয়, যা আদৌ সম্ভবপর নয়।

বস্তুতঃ বিরোধীপক্ষ এই দলিলকে দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ মনে করেছেন। কাজেই তারা উক্ত বিষয়টিকেও ত্রুটিপূর্ণ মনে করেছেন। কিন্তু তাঁরা একথা বুঝতে পারেননি যে, এই মাসআলাটি এবং অন্যান্য বিষয়াদিও যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী আলেমগণ বর্ণনা করেছেন; তা নূরে ফিরাসাতের মাধ্যমে, নবুয়তের নূর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এটা আমাদেরই দুর্বলতা যে, আমরা নিছক অনুমান এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত দর্শনকে বিপক্ষদলের সম্মুখে দলিল হিসেবে প্রকাশ করি এবং ভনিতা দিয়ে তা প্রতিষ্ঠার জন্যও চেষ্টা করি। এর ফলে বড় জোর এই হতে পারে যে, আমাদের অনুমান এবং আল্লাহ্প্রদত্ত দর্শন, বিপক্ষদলের জন্য দলিল হিসেবে গৃহীত হবে না। যদি তাই হয়, তবে আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে

বর্ণনা করা এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া ব্যতীত আর কিছুই করণীয় নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ মুসলমানের ন্যায় উত্তম আকীদায় বিশ্বাসী, সে একথা অকপটে কবুল করবে। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি ভাগ্যহীন সে তা অস্বীকার করবে।

মাতুরীদিয়া মতবাদের ফযীলত সম্পর্কেঃ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম শায়েখ আবু মানসুর মাতুরীদি[১] র. এর তরীকাহ কতোই না উত্তম। তিনি কেবলমাত্র উদ্দেশ্য বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এই মতবাদের আলেমগণ দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করা থেকে নিজেদেরকে সযত্নে দূরে রেখেছেন। উলামায়ে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মধ্যে শায়েখ আবুল হাসান আল্ আশ্'আরী[২] র. প্রথম ব্যক্তি, যিনি সূক্ষ্ম দার্শনিক ভঙ্গিতে দলিল প্রমাণাদির সাহায্যে বক্তব্য পেশ করতেন। তিনি ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাসমূহ দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। কাজটি খুবই কঠিন। বরং এ ধরনের কাজ বিরুদ্ধবাদীদেরকে আরো সাহসী করে তোলে, ফলে তারা দ্বীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে আশোভন উক্তি করে। সলফে সালেহীনদের তরীকাও পরিত্যাগ করে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে হক পন্থীদের আকীদার উপর সুদৃঢ় রাখুন, যারা নবুয়তের নূরে নূরান্বিত ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর পূর্ণ দরূদ ও সালাম।

---

১. শায়েখ আবু মানসুর মোহাম্মদ ইব্‌ন মোহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ আল-হানাফী; আল-মাতুরীদি, আল-সমরখান্দী–রহ. মাতুরীদিয়া মতবাদের জনক। মাতুরীদি ফিরকা সুন্নী-মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী একটি দল। মু'তাযিলা ও অন্যান্য মুক্ত–বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে এই দলের সৃষ্টি হয়। শায়েখ আবু মাননুর রহ. ইমাম আবুল হাসান আল-আশারী রহ. এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হিজরী ৩৩৩ সনে সমরখন্দে মৃত্যুবরণ করেন।

২. ইমাম আবুল হাসান আলী আশ্আরী –আশআরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইলমে কালামের জনক। তিনি ২৬০ হিজরীতে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি মুতাযিলী সম্প্রদায়ের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। পরবর্তী কালে শাফি'ই মজহাবের অনুসারী হিসাবে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল, দার্শনিক ভংগিতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রায় তিন শত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অনেক বড় বড় ইমাম ছিলেন। যেমন–ইমাম বাকেলানী, ইবন ফুরাক, ইসফারাইনী, আল-কুশায়েরী, জুওয়াইনী এবং ইমাম গাযযালী রহ। তিনি হিজরী ৩২৪ সনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

মিন্‌হা-তেতাল্লিশ

<u>**ইয়াকীনের দর্জা হাসিল হওয়া সম্পর্কেঃ**</u> আল্লাহ্‌পাকের কালাম— 'তোমার রবের নেয়ামত সম্পর্কে বর্ণনা কর' এর আলোকে আমি এই মহান নেয়ামতের কথা প্রকাশ করছি। এই ফকীরের 'ইলমে কালাম' বা কথা শাস্ত্র সম্পর্কিত বিশ্বাস, আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল্ জামা'আতের অভিমতের অনুরূপ। এর বিপরীতে ঐ ইয়াকীন বা বিশ্বাস, যা স্পষ্ট ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ধারণা বা খেয়ালের সমতুল্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন আমি এই ইয়াকীনকে–যা আমি ইলমে কালামের প্রত্যেকটি মাসআলা হতে লাভ করেছি, ঐ ইয়াকীনের সঙ্গে তুলনা করি, যা আমি সূর্যের অস্তিত্ব থেকে হাসিল করি; তখন প্রথম স্তরের ইয়াকীনের তুলনায়, দ্বিতীয় স্তরের ইয়াকীনকে ইয়াকীন বলতে আমার আফসোস্ হয়। জ্ঞানীগণ আমার এ বক্তব্য গ্রহণ করুন আর নাই-ই-করুন, বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তারা এটি অস্বীকার করবেন। কেননা, এই আলোচনাটি সম্পূর্ণ জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। প্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারীরা এটা অস্বীকার করবারই কথা।

এই ব্যাপারে 'হাকীকত' বা প্রকৃত রহস্য এই যে, ইয়াকীন বা বিশ্বাস হলো হৃদয়ের ব্যাপার। আর ঐ ইয়াকীন, যা সূর্য্যের অস্তিত্বের ব্যাপারে হৃদয়ে হাসিল হয়, তা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয়ে থাকে। এই ইন্দ্রিয়গুলি গুপ্তচর তুল্য, যা বিভিন্নভাবে জ্ঞান হাসিল করে হৃদয়ে পৌঁছায়। অপরপক্ষে, ঐ ইয়াকীন— যা ইলমে কালামের কোনো একটি মাসআলার সঙ্গে সম্পর্কিত— যা কল্‌ব বা হৃদয়ে হাসিল হয়, তা সরাসরি এবং কোনো ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতা ব্যতীতই হয়। বস্তুতঃ এই ধরনের ইয়াকীন, আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে ইলহাম হিসাবে, কোনো মধ্যস্থতা ছাড়াই হাসিল হয়ে থাকে। সুতরাং প্রথম প্রকারের ইয়াকীনের স্তর 'ইলমুল্ ইয়াকীন'' পর্যায়ের এবং দ্বিতীয় প্রকারের ইয়াকীনের স্তর 'আয়নুল্ ইয়াকীন' বা বাস্তব দর্শন পর্যায়ের। উভয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন কোনো কবির ভাষায় 'শ্রবণ কি হয় কভু দেখার সমান'?

মিন্‌হা-চুয়াল্লিশ

ফানায়ে ইরাদা বা ইচ্ছার অবলুপ্তি সম্পর্কেঃ যখন তালেবে হাকীকত বা হাকীকতের অনুসন্ধানকারীর বক্ষ, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ফযলে, সমস্ত আশা আকাংখা থেকে শূন্য হয় এবং সে হক সুবহানুহু ব্যতীত আর কারো প্রত্যাশী না হয়, এই সময় সে ঐ সমস্ত বস্তু লাভ করে, যা তার সৃষ্টির সময় উদ্দেশ্য ছিলো। তখন সে হাকীকি বা প্রকৃত বন্দেগী করতে সক্ষম হয়। অতঃপর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে অপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে পাঠান। এই সময় হকতায়া'লা তাকে একটি ইরাদা বা ইচ্ছা প্রদান করেন এবং একটি ইখতিয়ারও দেন, যাতে সে কাজে ও কথায় স্বাধীন ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়। যেমন, একটি অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম তার কাজ কর্মে স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এই মাকামটি 'আল্লাহ্‌র চরিত্রে' চরিত্রবান হওয়ার মাকাম। এই মাকামের অধিকারী ব্যক্তি যা কিছু চান, সবই অন্যের জন্য চান এবং তার উদ্দেশ্য থাকে অন্যের উপকার করা, নিজের নয়। আল্লাহ্‌তায়া'লার উদ্দেশ্যও এইরূপ। আর এই মহান সদিচ্ছা তো কেবল আল্লাহতায়া'লারই যোগ্য। আর এই 'সাহেবে ইরাদা' বা 'ইচ্ছাকারী' ব্যক্তির জন্য কখনোই এটি জরুরী এবং জায়েয নয় যে, সে যা চাইবে, তাই হবে। কেননা, এইরূপ ধারণা করা শিরক পর্যায়ের। হক্ সুবহানুহু তায়া'লা স্বীয় হাবীব মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে কোরআন পাকে এইরূপ ইরশাদ করেছেনঃ

'আপনি তাকে হেদায়েত দিতে সক্ষম হবেন না, যাকে আপনি ভালবাসেন, বরং আল্লাহ্ হেদায়েত দেন, যাকে ইচ্ছা করেন।' সাইয়েদুল বাশার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছায় যখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে, তখন অন্যদের সেখানে কি করার থাকতে পারে? আর এটাও জরুরী নয় যে, ইচ্ছাকারীর সমস্ত উদ্দেশ্য হক তায়া'লা ওয়া তাকাদ্দাসার মর্জির অনুরূপ হবে। যদি এমনই হতো, তবে আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কিছু কথা ও কাজের উপর, হক সুবহানুহুর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ নাযিল হতো না। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করেছেন 'নবীর জন্য এটি উচিত ছিলো না....(আয়াতে শেষ পর্যন্ত)। এই আয়াতের মধ্যে ক্ষমার কোনো অবকাশ নেই। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ

করেনঃ 'আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে স. ক্ষমা করেছেন। (দেখুন, আল- কোরআন, সুরা আন্ফাল, ৬৮ আয়াত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ) ক্ষমার চিন্তা তো সেই সময় করা হয়, যখন কোনোরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি হয়। এতদসংগে একথাও স্মরণীয় যে, হক তায়া'লা শানুহুর সমস্ত ইচ্ছা, তাঁর মর্জির অনুরূপ হয় না। যেমন— কুফরী এবং গুনাহ। (কেননা, এর ইরাদা তো হক্ তায়া'লা করেন। অন্যথায় এর অস্তিত্বই থাকতো না এবং তা বান্দা থেকে প্রকাশও পেতো না। কিন্তু এই কাজগুলো হক তায়া'লার মর্জির অনুরূপ নয়। যেমন আল্লাহ্তায়ালার ইরশাদ— 'আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় বান্দাদের নিকট থেকে কুফরীকে পছন্দ করেন না। সুতরাং আল্লাহ্র ইরাদা যখন তাঁর নিজেরই মর্জির খেলাফ হয়, তখন ইরাদাকারী বান্দার মর্জিও হক সুবহানুহুর খেলাফ হতে পারে।

মিন্হা-পঁয়তাল্লিশ

কালামুল্লাহ্র পথ প্রদর্শক হওয়া সম্পর্কেঃ সুলূকের রাস্তায় চলার পথে আমার পথপ্রদর্শক হলো— কালামুল্লাহ বা আল্লাহ্র কালাম। এই দৃষ্টিতে আমার পীর বা মোর্শেদ হলো কোরআন মজীদ। যদি কোরআনে করীমের হেদায়েত না আসতো, তবে সত্য মাবুদের ইবাদতের পথ প্রকাশিত হতো না। এই রাস্তার প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু 'আমি-ই ইলাহ' এই আওয়াজ দেয় এবং পথচারীকে স্বীয় উপাসনায় লিপ্ত করে। যদি উক্ত বস্তু তুলনীয় হয়, তবে নিজেকে অতুলনীয় হিসাবে প্রকাশ করে। আর যদি তা সাদৃশ্যযুক্ত হয়, তবে নিজেকে সাদৃশ্যবিহীন অবস্থায় প্রকাশ করে। এখানে ইম্কান বা সম্ভাব্যতা, ওজুব বা আবশ্যকতার সঙ্গে মিশ্রিত এবং ধ্বংস ও স্থায়ীত্ব একই সূত্রে গ্রথিত। যদি তা বাতিল বা মিথ্যা হয়, তবে তা হক বা সত্যের আকৃতিতে এবং যদি গুমরাহ হয়, তবে হেদায়েতের সুরতে প্রকাশিত হয়। বেচারা সালেক বা পথচারী, একজন অন্ধ মুসাফিরের মতো হয়ে যায় এবং প্রত্যেককে 'এইতো আমার রব' মনে করে তার দিকে মুখ ফিরায়। হক সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা স্বীয় প্রশংসায় ইরশাদ করেন— 'যমীন ও আসমানের স্রষ্টা।' আর তিনি স্বীয় শানে আরো ইরশাদ করেন— 'পূর্ব ও পশ্চিমের রব।' আমার 'উরুজ বা উর্ধ্বগমনের সময় যখন এই খেয়ালী মা'বুদসমূহকে আমার

সম্মুখে পেশ করা হলো, তখন তারা উপরোক্ত গুণের অধিকারী নয় বলে স্বীকার করলো এবং সকলে ধ্বংস হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় আমি 'আমি অস্তগামী ও ধ্বংসশীলদের ভালোবাসি না' একথা বলতে বলতে ঐ সমস্ত খেয়ালী মাবুদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম এবং যাতে ওয়াজিবুল ওজুদ বা আল্লাহ্‌তায়ালার যাত ব্যতীত অন্য কাউকে আমার কিবলাহে তাওয়াজ্জুহ মনে করলাম না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে এই ব্যাপারে হেদায়েত প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌ যদি আমাদেরকে হেদায়েত না দিতেন, তবে আমরা কিছুতেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম না। অবশ্যই আমাদের রবের রসুলগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন।

মিন্‌হা-ছেচল্লিশ

<u>হজরত খাজা বাকী বিল্লাহের প্রতি 'আকীদা সম্পর্কেঃ</u> আমরা চার ব্যক্তি, আমাদের মোর্শেদ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌ র. এর খেদমতে, অন্য সকল লোক অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলাম। হজরত খাজা র. সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের আকীদা বা বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন ছিলো এবং এইজন্য আমাদের ব্যক্তিগত হালও পৃথক ছিলো। এই ফকিরের অটল বিশ্বাস ছিলো এই যে, এ ধরনের সোহ্‌বত ও সমাবেশ এবং তারবীয়াত (প্রতিপালন) ও হেদায়েত, রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যামানার পরে, কখনো কারো হাসিল হয়নি। আর এ জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতাম যে, যদিও খায়রুল বাশার সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সোহ্‌বত বা সাহচর্য নসীব হয়নি, তবুও আমার মোর্শেদের মতো এমন মর্যাদাসম্পন্ন সোহবতের সৌভাগ্য হতে মাহরুম হইনি। আমাদের শায়েখ হজরত খাজা র. অবশিষ্ট তিন ব্যক্তি সম্পর্কে এইরূপ বলতেনঃ 'অমুক ব্যক্তি তো আমাকে পূর্ণতার অধিকারী বলে মনে করে, তবে সাহেবে ইরশাদ (হেদায়েতের পথ প্রদর্শক) বলে ধারণা করে না। আর তার নিকট ইরশাদের মরতবা, তাকমীলের মরতবা হতে উচ্চ'। আর ঐ ব্যক্তি 'সে আমার সাথে কোনো সম্পর্কই রাখে না।' আর তিনি তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেনঃ 'সে আমাদের অস্বীকারকারী।' বস্তুতঃ, আমরা প্রত্যেকে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী মারেফাতের অংশ হাসিল করেছি।

শায়েখের মহব্বতে আধিক্য প্রকাশ না করা সম্পর্কেঃ প্রকাশ থাকে যে, মুরীদের স্বীয় পীর সম্পর্কে উত্তম ও পূর্ণ হওয়ার ধারণা– মহব্বতের ফল ও সম্পর্কের পরিণতি স্বরূপ হয়ে থাকে, যা ফায়দা আদান প্রদানের কারণ হয়। কিন্তু এটা জরুরী যে, কেউ যেনো স্বীয় পীরকে ঐ সমস্ত বুজুর্গ ব্যক্তিদের উপর ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করে, যাঁদের বুজুর্গী এবং 'আজমত বা শ্রেষ্ঠত্ব শরীয়তের মধ্যে নির্ধারিত আছে। কেননা, এমন ধারণা করা বাহুল্যের কারণ হয়ে থাকে, যা নিন্দনীয় ব্যাপার। শিয়া মতাবলম্বীদের ভ্রষ্টতা এই যে, তারা কেবলমাত্র আহলে বায়েতগণের প্রতি মহব্বতের আধিক্য প্রকাশ করে। আর নাসারারা বা খ্রিস্টানগণ এই মহব্বতের আধিক্য প্রকাশ হেতু হজরত ঈসা আ. কে আল্লাহ্‌র বেটা বানিয়ে ফেলেছে। যার জন্যে তারা চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। শরীয়তে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত আছে, তাঁরা ব্যতীত, অন্যান্য লোকদের উপর নিজের পীরকে যদি কেউ ফযীলত দেয়, তবে তা জায়েয বা বৈধ। বরং এরকম করা তরীকতের উন্নতির জন্য ওয়াজিব স্বরূপ। এই ফযীলত প্রদান করা মুরীদের ইচ্ছানুযায়ী হয় না, বরং মুরীদ যদি যোগ্য হয়, তবে স্বতঃস্ফুর্তভাবে তার মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সে এর অসীলায় পীরের কামালাতসমূহ অর্জন করে। যদি এইরূপ ফযীলত প্রদান মুরীদের স্বেচ্ছাকৃত হয় এবং সে বাস্তবের বিপরীত এ ধরনের বিশ্বাসের সৃষ্টি করে, তবে তা জায়েয নয় এবং এর দ্বারা তার কোনো লাভও হয় না।

মিন্‌হা–সাতল্লিশ

নফী ও ইছবাত জিকির সম্পর্কেঃ কলেমায়ে তাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (অর্থাৎ নাই কোনো ইলাহ–আল্লাহ্ ছাড়া) এর সঙ্গে, নফী ও ইছবাতের জিকিরের মধ্যে সবচাইতে বুলন্দ দর্জা এই যে, যা কিছু দৃষ্টিতে ও জ্ঞানে এবং কাশ্‌ফ ও মুশাহিদার মধ্যে আসে, তা নিছক পবিত্র ও অবর্ণনীয় হলেও তার সবকিছুকে 'নফী' বা 'না' এর মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে এবং 'ইছবাত' বা 'হা' হিসাবে' বলবার সময় কলবের সমন্বয়ে মুখে আল্লাহ্ বলতে হবে। এতদ্ব্যতীত এর মধ্যে আর কোনোকিছুর অংশ থাকবে না। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

আন্‌কা শিকার যায় না করা।
জাল তুলে নাও– হে শিকারী,
জাল যে পাতে আন্‌কা আশায়
শূন্য হাতে যায় সে ফিরি’।

তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণকারী। তাঁর স. পরিবার পরিজনদের উপর সালাত ও সালাম।

মিন্‌হা–আটচল্লিশ

<u>**হাকীকতে কোরআন, হাকীকতে কা'বা ও হাকীকতে মোহাম্মদী সম্পর্কেঃ**</u> হাকীকতে কোরআন ও হাকীকতে কা'বায়ে রাব্বানীর স্থান হাকীকতে মোহাম্মদী স. এর উপরে। সুতরাং হাকীকতে কোরআন, হাকীকতে মোহাম্মাদীর ইমাম ও পথ প্রদর্শক এবং হাকীকতে কাবায়ে রাব্বানী, হাকীকতে মোহাম্মাদী স. এর সিজদার স্থান হয়েছে। আরো লক্ষ্যণীয় যে, হাকীকতে কা'বায়ে রাব্বানীর দরজা, হাকীকতে কোরআনের উপর। সেখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ 'বে সিফাতি ও বেরঙি বা রূপ গুণহীন। আর এ মাকামে শান ও ই'তিবারের কোনো স্থান নেই, বরং এই দরবারে পবিত্র ও পরিশুদ্ধিকরণেরও কোনো ক্ষমতা নেই। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

তথাকার সব চীজ হয় যে এমন,
বর্ণনার ঊর্ধ্বে তা, কি করি এখন।

এটা এমনই মারেফাত, যে সম্পর্কে কোনো আহলুল্লাহ মুখ খোলেননি, এমন কি ইংগিত ও ইশারাতেও এ সম্পর্কে কেউই কিছু বলেননি। এই ফকীরকে, এ মহান মারেফাতে ভূষিত করা হয়েছে এবং তুল্য সহযোগীদের মধ্যে সম্মানিত করা হয়েছে। এর সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাবীবের দানে এবং বরকতে আমার নসীব হয়েছে। তাঁর স. এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর পূর্ণ শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

হাকীকতে কা'বার স্থানে, হাকীকতে মোহাম্মাদীর 'উরুজ সম্পর্কেঃ প্রকাশ থাকে যে, কা'বার সুরত বা আকৃতি যেমন বস্তুর সুরতের সিজদার স্থান, তদ্রূপ হাকীকতে কা'বাও ঐ সমস্ত বস্তুর হাকীকতের সিজদার জায়গা। এখন আমি একটি আশ্চর্য ধরনের কথা বলবো, যা এর আগে কেউই শোনেনি এবং কোনো বর্ণনাকারী একথা বর্ণনা করেননি। এই রহস্য আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা তাঁর একান্ত অনুগ্রহে কেবলমাত্র ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন। উক্ত রহস্য এইঃ 'সারওয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের এক হাজার বৎসরের পরে এমন এক যামানা আসবে, যখন হাকীকতে মোহাম্মদী স্বীয় মাকাম থেকে উরুজ বা ঊর্ধ্বাগমন করে হাকীকতে কাবার সঙ্গে মিলিত হবে। এ সময় হাকীকতে মোহাম্মাদীর নাম হবে হাকীকতে আহমদী এবং তা 'যাতে আহাদ' বা একক যাতের জাল্লা সুলতানুহুর প্রকাশস্থল হবে। তখন উভয় মুবারক নাম (মোহাম্মাদ ও আহমদ), হাকীকতে মোহাম্মাদী ও হাকীকতে কা'বার মধ্যে স্থিত হবে। এ সময় হাকীকতে মোহাম্মাদীর প্রথম মাকাম (যেখানে তা ইতোপূর্বে ছিলো) খালি থাকবে এবং তা ততোদিন খালি থাকবে, যতোদিন না হজরত 'ঈশা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম অবতরণ করবেন। তিনি অবতরণের পর, শরীয়তে মোহাম্মাদী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর আমল করবেন। এই সময় হাকীকতে ঈসুবী স্বীয় মাকাম হতে 'উরুজ বা ঊর্ধ্বগমন করে, হাকীকতে মোহামম্মাদীর স. শূন্যস্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে, যা এতোদিন খালি ছিলো।

মিন্‌হা–উনপঞ্চাশ

কলেমায়ে তাইয়েবার ফযীলত সম্পর্কেঃ যদি কলেমায়ে তাইয়েবা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লহ' না হতো, তবে আল্লাহ্ জাল্লা সুলতানুহুর প্রতি কে রাস্তা দেখাতো? কে তৌহিদের চেহারার উপর থেকে পর্দা উন্মোচন করতো? কে জান্নাতের দরওয়াজা সমূহ খুলতো? অসংখ্য মানবীয় গুণাবলী 'লা' বা 'নাই' এর তলোয়ার দ্বারা কর্তিত হয় এবং দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত অগণিত বস্তু এই 'নফী' বা নাই এর পুনরুক্তির বরকতে দূর হয়ে যায়। আর এই কলেমার নফীর অংশ অর্থাৎ 'লা' বাতিল মা'বুদসমূহকে ধ্বংস করে দেয় এবং এর ইছবাতের অংশ (অর্থাৎ ইল্লাল্লহ), মা'বুদে বরহক্ জাল্লা শানুহুকে দৃঢ় ও অটল করে। সালেক এই কলেমার সাহায্যে ইম্‌কান বা সম্ভাব্যের স্তরসমূহ অতিক্রম করে এবং আরেফ বা আধ্যাত্মিক

দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই কালেমার বরকতে আবশ্যকীয় মি'রাজ বা ঊর্ধ্বারোহণ সম্পন্ন করে। এই কলেমাই তো তাজাল্লিয়াতে আফ্'আল থেকে মানুষকে তাজাল্লিয়াতে সিফাত পর্যন্ত নিয়ে যায় এাবং তাজাল্লিয়াতে সিফাত থেকে তাজাল্লিয়াতে যাতে পৌঁছে দেয়। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

'লা'–র ঝাড়ুতে রাস্তা যখন
হবে না পরিষ্কার
কেমনে তুমি পৌঁছবে বল
ঘরে ইল্লাল্লাহ্‌র।

তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণকারী।

মিন্‌হা–পঞ্চাশ

<u>মু'আরবেযাতাইনের ব্যাপারে কাশ্‌ফ সম্পর্কেঃ</u> হজরত মাখ্‌দুম শায়েখ শারফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানিরী র. তাঁর মকতুবাতে লিখেছেনঃ 'মুআরবেযাতাইন বা সুরা ফালাক্ ও নাস্–কে নামাজের মধ্যে না পড়া উচিত। কেননা, হজরত ইবন মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু, এই দুইটি সূরা কোরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে, জমহুর বা অসংখ্য আলেমের অভিমতের বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং নামাযের মধ্যে যতোটুকু কিরাআত পাঠ করা ফরয, তাতে তিনি এই দুটি সূরা পাঠ করতেন না। এই ফকীরও এই দুইটি সূরা নামাযের মধ্যে পড়তো না। এমতাবস্থায়, একদা এই ফকীরের উপর প্রকাশ পায় যে, যেনো মু'আরবেযাতাইন আমার নিকট উপস্থিত এবং তারা মাখদুম শায়েখ শরফুদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, তিনি কোরআন থেকে আমাদেরকে কেনো বহিষ্কার করলেন? এ সময় থেকে আমি সুরা দুটি ফরয নামাযের কিরআতে পাঠ করতে থাকি। আমি যখনই এ দুটি সুরা দিয়ে ফরয নামায আদয় করতাম, তখনই আশ্চর্য হালসমূহ অবলোকন করতাম। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যখন ইলমে শরীয়তের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়, তখন এ দুটি সুরা ফরয নামাযের মধ্যে পাঠ করাতে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতার

সৃষ্টি হয় না। বরং এটা সর্ববাদীসম্মত হুকুমের অকাট্যতার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা যা কিছু দফতরের মধ্যে লিখিত আছে, তার সবই কোরআন। এতদ্ব্যতীত, একথাও স্মরণীয় যে, যখন নামাযের মধ্যে সুরা ফাতিহার পরে, অন্য একটি সূরা মিলান ওয়াজিব, ফরয নয়; তখন এই সূরাদ্বয় আবশ্যকভাবে সূরা ফাতিহার সঙ্গে মিলিয়ে পড়াতে অসুবিধার কিছুই নেই। আমার তো শায়েখ ইয়াহইয়া মানিরী র. এর এই বক্তব্যে খুবই বিস্ময় বোধ হয়। সাইয়্যেদুল বাশার সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

মিন্হা–একান্ন

<u>তাক্লীদ্ ও ইত্তিবায়ের ফযীলত সম্পর্কে</u>ঃ সূফীয়ায়ে কিরামের তরীকা থেকে, বরং মিল্লাতে ইসলাম থেকে বড় অংশ ঐ ব্যক্তিই লাভ করেছে, যার মধ্যে তাক্লীদ বা অনুসরণের স্বভাব ও অনুসরণের অভ্যাস সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এখানে কার্যের সফলতা তাকলীদের উপর নির্ভরশীল এবং এই মাকামের ব্যাপারাদি পায়রবী বা আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আম্বীয়া আলায়হিমুস্ সালাত্ ওয়াত্ তাস্লীমাতের অনুসরণ সুউচ্চ দরজায় বা স্তরে পৌঁছে দেয় এবং সুফীদের পায়রবী উচ্চতম ঊর্ধ্বগমনে নিয়ে যায়। হজরত আবুবকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুর মধ্যে যেহেতু এাই ফিতরাত বা স্বভাব সবচাইতে বেশী পাওয়া যায়, সেইহেতু তিনি বিনা বিলম্বে নবুয়তের স্বীকারোক্তির সৌভাগ্য অর্জন করে সিদ্দীক বা সত্যবাদীদের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। অপরপক্ষে, অভিশপ্ত আবু জেহেলের মধ্যে তাকলীদ ও পায়রবীর স্বভাব না থাকায়, সে এই সৌভাগ্যের দ্বারা সৌভাগ্যভান্বিত হতে পারেনি। ফলে, সে অভিশপ্তদের দলনেতা হয়েছে। মুরীদেরা যে কামাল বা পূর্ণতা হাসিল করে, তা স্বীয় পীরের অনুসরণের দ্বারাই হাসিল করে। পীরের ভুলও মুরীদের শুদ্ধ হতে উৎকৃষ্ট। এ কারণে হজরত আবু বকর রা. হজরত পয়গম্বর আলায়হিস্ সালাত ওয়াস সালামের ভুলের আকাঙ্খা করতেন এবং বলতেন, কতোই না ভালো হতো, যদি আমি মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভুল হতে পারতাম। হজরত পয়গম্বর আলায়হিস্ সালাত ওয়াস সালাম হজরত বেলাল রা. সম্পর্কে বলেন 'বেলালের 'সীন' শবদটি আল্লাহ্তায়ালার নিকট

‘শীনের’ ন্যায় । হজরত বেলাল রা. অনারব হাবশের অধিবাসী থাকায়, আযানের সময় ‘আসহাদু’ উচ্চারণ করতেন এবং আল্লাহ্‌র মহান দরবারে তাঁর ‘আসহাদু’ বলা– ‘আশহাদু’ হিসেবে গৃহীত হতো। সুতরাং হজরত বেলাল রা. এর এই ত্রুটি অন্যদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হতে উত্তম। যেমন কোনো কবির ভাষায়ঃ

তব উচ্চারণ–আশ্‌হাদুর উপর,
হাসে যে–আস্‌হাদু বেলালের।

আমি একজন বন্ধুর নিকট শুনেছিঃ যে সকল দোয়া মাশায়েখদের নিকট থেকে বর্ণিত আছে, হঠাৎ যদি কেউ তার মধ্যে কোনোরূপ ভুল ত্রুটি করে গিয়ে থাকেন এবং তা সেই বিকৃত অবস্থায় অনুসারীরা তা পড়তে থাকে, যেইরূপে শায়েখ পড়তেন, তবুও তা ফলদায়ক হবে। কিন্তু যদি তা বিশুদ্ধভাবে পঠিত হয়, তবে তা ফলদায়ক হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে আম্বীয়া আ. এর তাকলীদ এবং আওলীয়াদের পায়রবীর উপর সুদৃঢ় রাখুন এবং রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাল্লামের পূর্ণ অনুসরণের তওফীক দান করুন। আমীন।

মিন্‌হা–বায়ান্ন

<u>**তাজাল্লীয়ে যাতের প্রেক্ষিতে আম্বীয়াদের মর্তবার পার্থক্য সম্পর্কেঃ**</u> হজরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবী–রসুলদের সরদার। অন্যান্য সাধারণ লোকদের তুলনায় তাঁর মর্যাদা কি, তা বলাই বাহুল্য। হজরত ঈসা ও মুসা আলায়হিমাস্ সালাত্ ওয়াস্ সালাম তাজাল্লীয়ে যাতের মাকাম থেকে, যোগ্যতা ও মর্তবা অনুযায়ী অংশ প্রাপ্ত। যেমন হক তায়া’লা হজরত মুসা ‘আলায়হিস্ সালামকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ ‘আমি তো তোমাকে আমার জন্য বেছে নিয়েছি’, অর্থাৎ আমার যাতের জন্য মনোনীত করেছি। আর হজরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম হলেনঃ ‘আল্লাহ্‌র রূহ’ এবং ‘আল্লাহ্‌র কলেমা বা কথা’। তাঁর ও সারওয়ারে আলম আলায়হিস্ সালাত্ ওয়াস্ সালামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অপরপক্ষে, হজরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাত ওয়াস্ সালাম যদিও তাজাল্লীয়ে সিফাতের মাকামের অধিকারী, তথাপিও তিনি সূক্ষ্মদর্শী। ঐ বিশেষ

অবস্থা, যা আমাদের পয়গম্বর আলায়হিস্ সালাত্ ওয়াস্ সালামের তাজাল্লীয়ে যাতের মাকামে নসীব হয়, ঐ অবস্থা হজরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের তাজাল্লীয়ে সিফাতের মাকামে হাসিল হয়। যদিও উভয়ের মধ্যে যোগ্যতার পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং, এই কারণে তিনি হজরত ঈসা ও মুসা আলায়হিমাস্ সালাম হতে উত্তম। পরন্তু হজরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম, হজরত মুসা আলায়হিস্ সালাম হতে উত্তম এবং তাঁর মর্তবা হজরত মুসা আ. এর উপরে। তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর পরের মর্যাদার অধিকারী হজরত নূহ আলায়হিস্ সালাম। যদিও হজরত নূহের আ. মাকাম তাজাল্লীয়ে সিফাতের মাকামে হজরত ইবরাহীম আ. থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, তথাপিও উক্ত মাকামে হজরত ইবরাহীম আ. এর একটি বিশেষ মর্যাদা আছে, যা অন্য কারো নসীব হয়নি। কিন্তু পায়রবী বা অনুসরণের ফলে, তাঁর আওলাদরা এই মাকাম হতে অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। হজরত আদম আলায়হিস সালামের দরজা হজরত নূহ আ. এর পরে। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত আম্বীয়া আলায়হিমুস্ সালামদের উপর দরূদ ও সালাম। উপরোক্ত আলোচনাটি ঐ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি স্বীয় ফযল ও করমে একথা আমাকে ইলহাম এর মাধ্যমে জানিয়েছেন। অবশ্য সঠিক ব্যাপার তো আল্লাহ্ সুবহানুহুই জানেন।

মিন্‌হা-তেপান্ন

<u>সায়েরে ইজমালীর মর্তবা-সায়েরে তাফ্‌সীলির ঊর্ধ্বেঃ</u> যে সালেকের সায়ের বা ভ্রমণ, আস্‌মা ও সিফাতের ব্যাপকতার মধ্যে পতিত হয়েছে, তাঁর যাতে জাল্লা সুলতানুহু পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কেননা, আস্‌মা ও সিফাতের তো কোনো শেষ- পরিসীমা নেই যে, তা অতিক্রম করার পর সালেক মনজিলে মাকসুদে পৌঁছবে। মাশায়েখগণ এই মাকাম সম্পর্কে বলেছেন যে, এই মাকামের কোনো শেষ সীমা নেই। কেননা, মাহবুবের কামালাত বা পূর্ণতা অনন্ত ও অসীম। আর এইস্থানে পৌঁছানোর অর্থ হলো আস্‌মা ও সিফাতের সঙ্গে মিলনমাত্র। ঐ সালেক বা আত্মিক ভ্রমণকারী ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যিনি আস্‌মা ও সিফাতের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে ভ্রমণ সম্পন্ন করেন এবং দ্রুততার সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র যাতের মিলন লাভ করেন।

<u>শেষস্তরে পৌঁছানোর পর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কেঃ</u> যাতের মিলন লাভকারী ব্যক্তিগণের জন্য উন্নতির সর্বশেষবিন্দু বা স্তরে পৌঁছানোর পর, দাওয়াত ও ইরশাদের দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা অত্যাবশ্যক। এই মাকাম থেকে প্রত্যাবর্তিত না হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। একথা এ সমস্ত মধ্যপন্থী হজরতদের মতের খেলাফ, যারা স্বীয় যোগ্যতানুসারে শেষস্তরে পৌঁছানোর পর প্রত্যাবর্তনকে জরুরী মনে করেন না। হতে পারে, তারা প্রত্যাবর্তন করেন, অথবা এও হতে পারে যে, তারা সেখানে থাকাই পছন্দ করেন। সুতরাং, যারা শেষস্তরে পৌঁছান, তাদের ব্যাপারে বলা যায় যে, তারা পূর্ণতার অধিকারী হন। কিন্তু যারা আসমা ও সিফাতের বিশালতার মধ্যে সায়ের করেন, তাদের পৌঁছানোর শেষ স্তর কিছুই নেই; যেখানে পৌঁছানোর পর তাদের পূর্ণতা হাসিল হতে পারে। এই জ্ঞান ঐ বিশেষ জ্ঞানসমূহের অংশ, যা এই ফকীরকে দান করা হয়েছে। বস্তুতঃ সঠিক জ্ঞান তো আল্লাহ্ সুবহানুহুর নিকটেই।

মিন্‌হা-চুয়ান্ন

<u>মাকামে-রিযার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেঃ</u> মাকামে রিযা বা সন্তুষ্টির মাকাম, বেলায়েতের সমস্ত মাকামের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই বুলন্দ মাকাম তখনই হাসিল হয়, যখন সুলূক ও জযবা পূর্ণতা লাভ করে।

একটি প্রশ্নঃ যদি কেউ এইরূপ প্রশ্ন করে যে, যখন যাতে হক্ সুবহানুহু, সিফাতে হক তায়া'লা এবং আফআলে হক্ সুবহানুহুর প্রতি রিযা বা সন্তুষ্টি ওয়াজিব এবং এটা ইমানেরও অংশবিশেষ; যার প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রতিটি সাধারণ মুসলমানের জন্য জরুরী। এমতাবস্থায়, সুলূক ও জযবার পূর্ণতা প্রাপ্তির পর, এই মাকাম হাসিল হওয়ার অর্থ কি?

উত্তরঃ এর উত্তরে আমার বক্তব্য হলো— রিযার একটি বাহ্যিক সুরত আছে এবং তার হাকিকতও আছে। একইরূপে, ইমানের সমস্ত আরকানের জন্য একটি সুরত এবং একটি হাকীকত আছে। প্রথম অবস্থায় সুরত বা আকৃতি লাভ হয় এবং সবশেষে হাকীকত বা মূল প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন মানুষের কাছ থেকে এমন কোনো কথা প্রকাশ না পায়, যা রিযার বিপরীত; এমতাবস্থায় বাহ্যিক শরীয়ত অনুযায়ী

ফয়সালা দেওয়া যায় যে, লোকটির রিযা হাসিল হয়েছে। এটা অন্তরের বিশ্বাসের মতো, যখন ঐ বিশ্বাসের বিপরীত কোনো কথা প্রকাশ না পায়, তখন বলা যায় যে, তার বিশ্বাস সঠিক। কিন্তু আমরা (সালেকীন ও আরেফীন) যে সম্পর্কে বলছি, তাহলো– হাকীকতে রিযা হাসিল হওয়া, কেবল সুরতে রিযা নয়। আল্লাহ সুবহানুহু এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত।

মিন্হা–পঞ্চান্ন

<u>সুন্নতের অনুসরণ ও বিদ্আত পরিত্যাগ সম্পর্কেঃ</u> সুন্নতের উপর আমল এবং বিদ্'আত পরিহার করার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। বিশেষতঃ এমন বিদ্আত পরিহার করা জরুরী যা সুন্নতকে খতম করে দেয়। যেমন রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদঃ 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে নতুন কিছু আমদানী করবে, সে অবশ্যই পরিত্যজ্য।'

ঐ জামা'আতের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ হয়, যারা দীনের মধ্যে নিত্যনতুন বিষয় সংযোজন করে। এমতাবস্থায় যে দীন সবদিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পূর্ণতার শেষ প্রান্তে উন্নীত হয়েছে। যারা দীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের সংযোজনের মাধ্যমে এর পূর্ণতা প্রদানের জন্য সচেষ্ট; তাদের কি এতটুকু আশংকা নেই যে, আল্লাহ্ না করুন–এই নতুন বিষয়ের সংযোজনের ফলে হয়তো দীন খতম হয়ে যাবে? যেমন, পাগড়ীর শাম্লা (বা ঝুলন্ত অংশ) কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে রাখা সুন্নত। কিন্তু অনেক লোক একে বামদিকের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করে এবং এই ব্যাপারে তারা মৃতদের অনুসরণে আগ্রহী। আর বহু লোক এই ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করছে। তারা একথা জানে না যে, তাদের এই ধরনের আমল সুন্নতের পরিপন্থী। তারা সুন্নতকে পরিত্যাগ করে, বিদ্আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যা পরিশেষে হারামের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উত্তম, না মৃতদের সঙ্গে। রসুল আকরাম সল্লাল্লাহু তায়া'লা আলায়হি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম তো ছিলেন এমন মৃত্যুর অধিকারী, যা দৈহিক মৃত্যুর আগে সংঘটিত হয়। ঐ সমস্ত লোকেরা মুরদার সঙ্গে

সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়, অথচ তাদের উচিত ছিলো রসুল পুর নূর সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলোঃ মৃতের কাপনের মধ্যে পাগড়ী ব্যবহার করাই তো বিদ্‌আত, এমতাবস্থায় পাগড়ীর শামলার ব্যাপারে কি বলার আছে। অবশ্য পরবর্তীকালের কিছু উলামাদের অভিমত হলোঃ যদি মৃতব্যক্তি দীনের আলেম হয়, তবে তার কাফনের সময় পাগড়ী দেওয়া মুস্‌তাহসান বা ভালো। কিন্তু ফকীরের অভিমত এই যেঃ কাফনের সুন্নত পরিমাণের মধ্যে বেশী করা, সুন্নতের পরিবর্তনের মতোই এবং আসল সুন্নত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, সুন্নতকে পরিত্যাগ করা। আল্লাহ্‌ সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা আমাদেরকে হজরত মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বুলন্দ সুন্নতের পায়রবীর উপর সুদৃঢ় রাখুন। আর আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ বান্দার উপরও রহম করুন, যে আমার এই দোয়ার উপর আমীন বলে। (আল্লাহুম্মা আমীন)।

মিন্‌হা-ছাপ্পান্ন

<u>**জীনদের অবস্থা সম্পর্কেঃ**</u> একদা জীনদের অবস্থা এই ফকীরের উপর প্রকাশ করা হয়। এই ফকীর দেখতে পায় যে, জীনেরা মানুষের মতো বিভিন্ন অলিতে গলিতে বিচরণ করছে এবং প্রত্যেক জীনের মাথার উপর একজন ফিরিশতা নিয়োজিত আছে। আর ঐ জীনটি ফিরিশ্‌তার ভয়ে মাথা তুলতে পারছে না এবং নিজের ডানে ও বামে দৃষ্টিপাত করতেও সক্ষম হচ্ছে না। তারা কয়েদী এবং শৃঙ্খলাবদ্ধদের ন্যায় বিচরণ করছে এবং কোনোরূপ বিরোধিতার শক্তি তাদের নেই। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌তায়া'লা ইচ্ছা করেন, তখন তারা কিছু করে। এই সময় আমার নিকট এরকম মনে হলো যে, নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাদের হাতে লোহার গদা আছে, যদি তারা জীনদের থেকে সামান্যতম বিরোধিতার আশংকা করে, তবে একই আঘাতে সে জীনের জীবন শেষ করে দিতে প্রস্তুত। যেমন কোনো কবির ভাষায় ঃ

সৃষ্টি করেছেন প্রভু-উত্তম ও অধমে,
রেখেছেন শক্তিহীনকে-শক্তির কদমে।

মিন্‌হা-সাতান্ন

নবীর উপর ওলীর আংশিক প্রাধান্য সম্পর্কেঃ ওলী যে কামালাত-ই হাসিল করুন এবং যে স্তরে পৌঁছান না কেনো, তিনি স্বীয় নবী আ. এর পায়রবীর তোফায়েলে সেখানে পৌঁছান। যদি নবীর অনুসরণ এবং পায়রবী না হতো, তবে ইমানই নসীব হতো না এবং উচ্চ মর্তবা হাসিলের রাস্তাও উন্মুক্ত হতো না। সুতরাং কোনো ওলী যদি আংশিক ফযীলতসমূহ থেকে এমন কিছু ফযীলত হাসিল করে, যা নবীর লাভ হয়নি এবং যদি তার বুলন্দ দারাজাত বা উঁচু মরতবাসমূহ থেকে কোনো বিশেষ মরতবা নসীব হয়, যা নবীর হাসিল হয়নি; এমতাবস্থায় এটা নিশ্চিত যে নবীরও এই আংশিক ফযীলত এবং খাস্ মরতবা হতে পূর্ণ অংশ হাসিল হয়। কেননা, ওলীর মধ্যে এই পূর্ণতা লাভ, ঐ নবীর পায়রবীরই ফলশ্রুতি এবং এই সমস্ত কামালাত ঐ নবীর সুন্নতের অনুসরণেরই ফলমাত্র। কাজেই, এটা নিশ্চিত যে, নবী ঐ কামালাতের পূর্ণ অধিকারী। যেমন রসুল পুর নূর সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদঃ 'যিনি কোনো নেক তরীকার প্রচলন করলেন, তিনি তার সওয়াব প্রাপ্ত হবেন এবং তিনি তাদের সমান সওয়াব পাবেন— যারা এর উপর আমল করবে।'

অবশ্য ওলী এই পূর্ণতা প্রাপ্তির কারণে পূর্ববর্তী এবং এই দর্জায় পৌঁছানোর দিক দিয়ে সর্বপ্রথম হবেন। আর ওলীর, নবীর উপর এই ধরনের ফযীলত প্রাপ্তিকে আলেমগণ জায়েয বলেছেন। কেননা, এটা আংশিক ফযীলত মাত্র, যা পূর্ণ ফযীলতের আদৌ সমতুল্য নয়। আর ফুসুসুল হিকামের লেখক[১] বলেনঃ খাতিমুল আম্বীয়া সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইল্‌ম ও মারেফাতসমূহ খাতিমুল বেলায়েতের

১. হজরত শায়েখ মহীউদ্দীন মোহাম্মদ বিন আলী ইবন আরাবী কাদ্দাসা সিররুহু, ৫৬০ হিজরীর ১৭ই রমজান, স্পেনের প্রসিদ্ধ শহর মরসীয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৩৮ হিজরীর ২২শে রবিউল আখির, দামেশকে ইনতিকাল করেন। তিনি ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিনে পারদর্শী ছিলেন এবং একজন নামকরা দার্শনিক ছিলেন। তিনি তাওহীদে ওজুদী বা সবই তিনি, এই মতবাদ প্রচার করেন। যার প্রকৃতস্বরূপ অনেকে বুঝতে না পারায় দারুন মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি কাদ্দাসা সিররুহু তাওহীদে শুহুদী বা সবই তাঁর দিক থেকে, মতবাদ পেশ করে সমস্ত মতানৈক্য দূরীভূত করেন। হজরত শায়েখ ইবন আরাবী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'ফুসুসুল-হিকাম' এবং 'ফতুহাতে-মককীয়া' বিশেষ স্মরণীয়।

নিকট থেকে হাসিল করেন, কাজেই, তিনিও এই মারেফাতের প্রতি অনুরক্ত এবং এই ফকীরকেও এই মারেফাতের দ্বারা অভিসিক্ত করা হয়েছে এবং এটা শরীয়তের অনুরূপ। বস্তুতঃ, ফুসুসুল হিকামের ব্যাখ্যাকারগণ উপরোক্ত বর্ণনাটির সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য বাহানার আশ্রয় নিয়েছেন এবং বলেছেনঃ প্রকৃতপক্ষে খাতিমুল বেলায়েত হলো খাতিমুন নবুয়তের খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষ স্বরূপ। যখন বাদশাহ্ স্বীয় কোষাগার থেকে কিছু নিতে চান, তখন প্রকাশ্যতঃ তিনি খাজাঞ্চির কাছ থেকেই নেন; এতে বাদশাহের ইজ্জতের কোনো হানি হয় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাই, যা আমি ওপরে বর্ণনা করেছি। তাদের বাহানার কারণ হলো, এর হাকীকত বা আসল তত্ত্ব না জানা। আল্লাহ্ সুবহানুহু সব কাজের হাকীকত সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। সাইয়েদুল বাশার সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর দরূদ ও সালাম।

মিন্‌হা–আটান্ন

ওলীর বেলায়েত, নবীর বেলায়েতেরই অংশঃ ওলীর বেলায়েত, স্বীয় নবীর বেলায়েতেরই একটি অংশ মাত্র। ওলীর যতো উঁচু মরতবাই হাসিল হোক না কেনো, তা ঐ নবীর প্রাপ্ত মরতবাসমূহের একটি অংশ মাত্র। আংশিকের মর্যাদা যতোই হোক না কেনো, তা সমস্ত অংশের চাইতে অবশ্যই কম। কেননা, পূর্ণ অংশ, কিছু অংশ হতে অধিক, এটাই বাস্তব সত্য। সেই ব্যক্তি আহমক যে এইরূপ ধারণা করে যে, কিছু অংশ, পূর্ণ অংশের চাইতে অধিক। কেননা, পূর্ণ অংশের অর্থ হলো, অন্যান্য অংশের সঙ্গে, এই কিছু অংশও পূর্ণ অংশের মধ্যে মওজুদ আছে।

মিন্‌হা–উনষাট

সিফাতে বারী তায়া'লা সম্পর্কেঃ আল্লাহতায়া'লার 'সিফাতে ওয়াজিবী' বা অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী তিন ধরনের। প্রথম হলো সিফাতে ইযাফীয়া বা অতিরিক্ত গুণাবলী। যেমন— সৃষ্টিকারী, রিযিক দাতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় হলো সিফাতে হাকাকিয়া বা প্রকৃত গুণাবলী, কিন্তু এর সঙ্গে অতিরিক্ত গুণাবলীও মিশ্রিত আছে। যেমন— 'ইলম, কুদরত, ইরাদা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি এবং তৃতীয় হলো— হাকীকতে মহয বা বিশুদ্ধ হাকীকত। যেমন— হায়াত বা জীবন। এর মধ্যে অতিরিক্ত সিফাত মিশ্রিত নেই। আর আমাদের নিকট সিফাতে ইযাফীয়ার অর্থ হলো এমন গুণাবলী যা দুনিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তৃতীয় অংশটি, তিনটি অংশের মধ্যে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ এবং সমস্ত গুণাবলীর মাতাস্বরূপ। সিফাতে ইলম, নিজের সম্পূর্ণতার সঙ্গে সিফাতে হায়াতের অধীন। আর সিফাত ও শুয়ুনাতের এই বৃত্ত– সিফাতে হায়াতের উপর সমাপ্ত হয়। বস্তুতঃ উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার দরওয়াজা হলো এই সিফাত। যেহেতু সিফাতে হায়াতের মরতবা সিফাতে ইলমের উপরে। কারণ, ঐ স্থানে পৌঁছবার জন্য ইলমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করা প্রয়োজন। চাই তা ইলমে জাহির বা প্রকাশ্য ইলম হউক বা ইলমে বাতিন বা গোপন ইলম কিংবা ইলমে শরীয়ত হউক বা ইলমে তরীকত। খুব কমসংখ্যক ব্যক্তিই এই স্তরে উপনীত হতে পারে। যারা সংকীর্ণতা থেকে স্বীয় দৃষ্টি এই দিকে নিক্ষেপ করে, তাদের সংখ্যাও খুবই কম। আমি এই মাকামের গোপন তথ্যাবলী থেকে যদি একটিও প্রকাশ করি, তবে আমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। যেমন কোনো কবির ভাষায় ঃ

এর পরে কিছু বলা নয় সমীচীন
এই ভালো যদি থাকি গোপনে বিলীন।

তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যারা হেদায়েতের অনুসারী এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ ইত্তেবাকারী।

মিন্হা–ষাট

<u>হক তায়া'লার মিছাল হয় না, মিছাল হতে পারেঃ</u> হক সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা 'মিছাল' বা সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। যেমন আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'তাঁর সাদৃশ্য কিছুই নাই।' কিন্তু 'উলামারা 'মিছাল' বা 'মাছাল' কে জায়েয বলেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণীঃ 'আল্লাহ তায়া'লার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপমা আছে, অথবা আল্লাহ্‌র জন্যই তো সর্বোকৃষ্ট শান বা মর্যাদা'। সুলূকের পথে ভ্রমণকারীগণ এবং কাশফের অধিকারীরা উপমার দ্বারাই শান্তিপ্রাপ্ত হন এবং ধ্যানের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করেন। তারা বর্ণনাহীনকে বর্ণনাযুক্ত দেখতে থাকেন এবং যাতে ওয়াজেবকে সম্ভাবনার আকৃতিতে পেতে থাকেন। বেচারা সালেক, দৃষ্টান্তকে দৃষ্টান্তের মালিকের অনুরূপ মনে করে এবং সুরত বা আকৃতিকে— আকৃতির মালিকের অনুরূপ ধারণা করে থাকে। এর কারণ এই যে, সালেক হক্ সুবহানুহু ওয়া তায়া'লার পরিবেষ্টনকারী আকৃতিকে, সমস্ত বস্তুর মধ্যে পরিদর্শন করে এবং ঐ পরিবেষ্টনের উপমাকে সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে মুশাহিদা করে এবং সে মনে করে যে, যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তার সবই হক সুবহানুহুর আবেষ্টনীর হাকীকত। কিন্তু, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেননা, হক তায়া'লার বেষ্টনী তো দৃষ্টান্ত ও তুলনাহীন এবং তিনি শুহুদ বা দর্শন এবং প্রকাশ পাওয়া অবস্থা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আমরা এই কথার উপর ইমান রাখি যে, আল্লাহ্‌তায়া'লা সব বস্তুর পরিবেষ্টনকারী; কিন্তু আমরা তাঁর এই পরিবেষ্টনের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত নই? আমরা যা কিছু জানি, তা হলো এই পরিবেষ্টনের তুল্য অবস্থা। হক্ তায়া'লার কুরব বা নৈকট্য এবং মা'য়ীআত বা সঙ্গতাকে এর উপর কিয়াস বা ধারণা করতে হবে। যা কিছু কাশ্‌ফ ও মুশাহিদার মধ্যে আসে, তা তো আনুরূপ্য মাত্র, হাকীকত বা আসলরূপ নয়। বরং এই সমস্ত কথার বাস্তবরূপও অজ্ঞাত। আমরা এর উপর ইমান রাখি যে, হক তায়া'লা আমাদের নিকটে এবং সঙ্গে, কিন্তু আমরা এটা জানি না যে, এই নৈকট্য ও সঙ্গতার হাকীকত কি? এ সম্পর্কে হাদীছে ইরশাদ আছেঃ 'আমাদের রব হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় প্রকাশিত হবেন।' এই বাক্যে রসুলুল্লাহ স. মিছালী আকৃতি বর্ণনা করেছেন। কারণ, পূর্ণ রেজা (সন্তুষ্টি) অর্জনের দৃষ্টান্ত হাস্যোজ্জ্বল আকৃতিই হওয়া উচিত। একইভাবে হাত, চেহারা, পা, অঙ্গুলী ইত্যাদির দৃষ্টান্তও অনুমান করা যেতে পারে।

আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এরকমই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই অনুগৃহীত বান্দার মর্যাদায় ভূষিত করেন। আমাদের সরদার মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ স. এবং তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি দরূদ ও সালাম।

মিন্‌হা—একষট্টি

সতর্কবাণীঃ হাল্, জয্‌বা, ইল্‌ম ও মারেফাতসমূহ বর্ণনার কালে, যদি এই লেখকের বক্তব্যের মধ্যে কোনোরূপ বৈসাদৃশ্য ও বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়, তবে তা সময়ের বিভিন্নতা এবং হাল ও অবস্থার পার্থক্যের কারণে হয়েছে মনে করতে হবে। কেননা, প্রত্যেক সময়ের হাল ও জয্‌বাসমূহ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক অবস্থার জ্ঞান ও মারেফাতসমূহ স্বতন্ত্র হয়। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো বৈসাদৃশ্য ও বৈপরিত্য নয়। এর উদাহরণ শরীয়তের হুকুম আহকামের মতো। যেমন তা মানসুখ বা পরিবর্তনের পর, বিপরীত হুকুম বলে মনে হয়। কিন্তু যখন সময় ও অবস্থার বিভিন্নতাকে সম্মুখে রাখা হয়, তখন এ মতানৈক্য ও বৈপরিত্য আর থাকে না। এর মধ্যে আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়া'লার হিকমত এবং কল্যাণ নিহিত আছে। কাজেই, তোমরা কেউই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আমাদের নেতা ও সরদার হজরত মোহম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর দরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল হোক।



আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী-প্রথম খণ্ড
মাআরিফে লাদুন্নিয়া

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆ চেরাগে চিশ্তী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆ নুরে সেরহিন্দ
কালিয়ারের কুতুব ◆ প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆ তুমিতো মোর্শেদ মহান
নবীনন্দিনী ◆ কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
ফোরাতের তীর ◆ বায়ানুল বাকী

আবার আসবেন তিনি ◆ সুন্দর ইতিবৃত্ত
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মহা প্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆ নামাজের নিয়ম
রমজান মাস ◆ ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM
মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি
ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ
ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

ISBN 984-70240-0032-1

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া